

প্রদ্যুশন ভট্টাচার্য
বিদ্যাসাগর এবং বেসরকারি সমাজ

[illegible]

আমি জানি ইতিহাস টাইরেনিয়াস

আমার ছু চোখ অন্ধ, আমি শুধু অন্ধকারে দেখি
অতীতের কাদা আর ভবিষ্যৎ রাবিশে কাদায়
বোজানো ডোবার জল

বিষ্ণু দে

গোলাম মুরশিদ-সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর' বইটির খ্যাতি আছে। দেখলুম, ওই বইয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, "...বিধবাবিবাহের সংস্কার আন্দোলনে তিনি [বিদ্যাসাগর] প্রচুর অর্থ ও শক্তি ব্যয় করলেও নিজের কথা, লেখা ও কর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর কৃষক সমাজের সুখ-দুঃখের প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন।"১

বদরুদ্দীন উমর নামজাদা বুদ্ধিজীবী। তাঁর এ সিদ্ধান্তে—যদি একে 'সিদ্ধান্ত' বলি—বিমূঢ় বোধ করছি। প্রথমতঃ, নিজের কথা, লেখা ও কর্মের 'মাধ্যমে' সম্পূর্ণ উদাসীন থাকাটা ঠিক কী বস্তু, তা সহজে বোধগম্য নয়। তারপর, ব্যাকরণ না-হয় বাদই দিলুম, কিন্তু তথ্য? তথ্য যে অন্য কথাই বলছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার কিছু কাল পর থেকে আমাদের ভদ্রলোক-সম্প্রদায়ের অনেকেই কৃষকের কণ্ঠে গলদশ্রু; কেউ-কেউ জমিদার-পরিবাদেও পণ্ডিত। কিন্তু এই কৃষকবাৎসল্য কখনও তাঁদের খাজনাভোগে বাদ সাধে নি। কৃষকশোষণের ব্যাপারে কথা আর কাজের মধ্যে ভদ্রলোকদের এই-যে পুরুষাণুক্রমিক কারচুপি, এইটে থেকে বিদ্যাসাগর মুক্ত। এক্ষেত্রে তাঁর আচরণ একেবারে নজিরবিহীন। একদা ওপরপড়া হয়ে বিদ্যাসাগরকে বীরসিংহ গ্রামের পত্তনিতালুক দিতে চেয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজা। সে দান নেন নি বিদ্যাসাগর। বলেছিলেন, ওঁর যখন এমন অবস্থা হবে যে সমস্ত প্রজার খাজনা উনি নিজেই চুকিয়ে দিতে পারবেন, তখন নেবেন ওই পত্তনিতালুক। যেসবুগে প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকই কোনো-না-কোনোভাবে, স্বনামে বা বেনামে, খাজনাজীবী, সেসবুগে পত্তনিদারের এমন সদুযোগ, এভাবে, এত স্পষ্ট নীতির ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যানের নজির আর কই? নীতির কথাটা আরও স্পষ্ট হবে, যদি ঠাকুরদা রামজয়ের কতকটা এই ধরনের একরোখা প্রত্যাখ্যানের একটি ঘটনার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই পত্তনিবর্জনের তুলনা করি। বাস্তবিক, রামজয়ের সঙ্গে ওঁর চারিত্রিক মিল তো আছেই; আশ্চর্যরকমের মিল আছে এই দুজনের জীবনচরিতেও। এরকম একটি সমান্তরাল আখ্যান হল : বীরসিংহ গ্রামে রামজয়ের বাস্তুভূমিটুকু ওঁকে জমিদার মশাই চিরকালের জন্যে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করে দেবার প্রস্তাব দিলে, সেই দান এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ফিরিয়ে দেন। এ ঘটনার যে-বিবরণ শঙ্কুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, তা পড়ে মনে হয়, এই ভূমিদান গ্রহণ করতে রামজয়ের আত্মসম্মানে বেধেছিল। অন্য পক্ষে, বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা শূন্যই আত্মসম্মানের নয়। বিদ্যাসাগর 'না' বলছেন, অন্য ধরনের এক তীক্ষ্ণ নীতির ওপর দাঁড়িয়ে : তিনি

খাজনাজীবী হতে নারাজ ; তিনি চান, চাষীর জমি নিষ্কর হোক। এই একই নীতি বাস্তব হয়ে ওঠে ‘সোমপ্রকাশ’-এর সম্পাদকীয়তে। একটু পরেই আমি ‘সোমপ্রকাশ’-এর একটি মন্তব্য (২৪ জুলাই ১৮৮২) তুলব, যেখানে সম্পাদক সরাসরি চাইছেন ‘প্রজারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করুক’। নীতির, এবং যা আরও বড়ো—আচরণের—প্রশ্ন জড়িত বলেই বিদ্যাসাগরের এই সচেতন প্রত্যাখ্যান আমাদের সামাজিক ইতিহাসে একটি তাৎপর্যময় তথ্য।

‘সম্পূর্ণ উদাসীন’ ? কথাতো ? কিন্তু প্রিয়জন-পরিজনের কাছে তিনি যে-সমস্ত উক্তি করেন তাতে তো ‘নিম্নশ্রেণী’র প্রতি উদাসীন্য নয়, উদ্বেগময় লিপ্ততাই ফুটে ওঠে। যেমন : ‘নব্য ভারত’-এর সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীকে বিদ্যাসাগর বলেন, ‘বাংগালার নিম্নশ্রেণীর আবার উন্নতি হইবে ? যাহাদিগকে আমরা পশুর ন্যায় জ্ঞান করি,—স্বার্থ সাধনের উপায় সরূপ [স্বল্পরূপ] মনে করি, তাহাদিগের আবার গতি ফিরিবে ? সাহেবেরা আমাদের ঘৃণা করে বলিয়া আমরা কত আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা নিম্নশ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণার চক্ষে দেখি !! হায়, শিক্ষিত শ্রেণীর এতই অহঙ্কার, এতই অভিমান ; দেশের শক্তি যাহারা, আশা ভরসা স্থল যাহারা, তাহাদিগকে মনুষ্যের শ্রেণীতে গণ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন।’^২ দুটি কারণে এই উক্তি গুরুত্বময় : এক. দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী এই কথাগুলি ছাপেন ১২৯১ সালে চৈত্র মাসের ‘নব্য ভারত’-এ, যখন বিদ্যাসাগর জীবিত। সুতরাং এই উক্তির প্রামাণিকতা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। দুই. পরে দেখব, চাষীদের প্রতি ‘সোমপ্রকাশ’-এর মনোভাবও অনেকটা এইরকম ছিল ; বস্তুতঃ এই মিলটুকু এত বেশি যে লক্ষ্য না করে পারা যায় না। বিদ্যাসাগরের আরেকটি উক্তি মনে পড়ছে। মৃত্যুর আগে, শেষ রোগশয্যার সূচনায়, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যকে তিনি বলেছিলেন, ‘বাবুরা কংগ্রেস করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন, আশ্বাফলন করিতেছেন। দেশের সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রতিদিন মরিতেছে তাহার দিকে কেহই দেখিতেছে না।’^৩

আর কাজে ? ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ড বা ১৮৬৯ সালে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া মহামারী শুরুর হলে হিন্দু-মুসলমান চাষীদের মধ্যে তাঁর সেবাকর্ম অথবা কমিটিং সাঁওতালদের^৪ পরমাত্মীয় করে নেওয়ার খবর তো সকলেই জানে। তবে এরকম উল্টো কথা উমর সায়েব বলছেন কীসের ভিত্তিতে ? কেন ? লোকে তো বরং জানে যে ভদ্রলোকদের সঙ্গেই তাঁর একটা বিচ্ছেদ ঘটে যায় ; যে-কারণে তিনি বলেছিলেন, ‘তোমাদের মতো ভদ্রবেশধারী আর্থসন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সাঁওতাল ভালো লোক’।^৫ একবার ইংরেজিওয়ালা তর্কিক বাবুদের ধিক্কার দিয়ে বলে ওঠেন : ‘ছেলেপুলেকে আর-যা করি, ইংরেজি তো কখনও শেখাব না, অসার ও ডে’পো হবার এমন পথ আর নেই।’^৬ শেষ বয়সে, মৃত্যুর বছর সাতেক আগে, আরেকবার উঁচু সমাজের মর্দুদ্বৈতের ধিক্কার দিয়ে ভাষায় রাজা লিয়র-এর সেই আকাশফাটানো বজ্রাগ্নির বলক এনে লিখেছিলেন, ‘এ দেশের মূখে ছাই ; এ দেশের সর্বপ্রধান সমাজের মূখে

ছাই...’।^৭ বিদ্যাসাগর-জীবনীর এসব সর্বজনজ্ঞাত, প্রাথমিক তথ্য কি বদরুদ্দীন উমর জানেন না? না, বেয়াড়া তথ্যের ওপর ধামা চাপা দিয়ে ঝোঁকের মাথায় তাত্ত্বিক ছক বানানোর রোগ তাঁকেও পেয়ে বসেছে? তাহলে ভয়েরই কথা। কারণ, কী শিল্পসাহিত্যে, কী রাজনীতিতে, এই বাবুবিচারের প্রকোপ আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি।

‘সাধারণী’-র ফাইলে আমি একটা খবর পেয়েছি, যা উমর সায়েবের ‘সিদ্ধান্ত’ সম্পর্কে আরও সংশয় জাগায়। খবরটা এই : একবার জনরব রটেছিল, বিদ্যাসাগর মশাই এমন একটা কৃষকসভা বানাতে চান, যেখানে জমিদাররা ঢুকতে পারবে না। এই খবর, আর তা পেশ করার ধরণ, আজকের পাঠকদের উপাদেয় লাগবে বলে, ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৮০ সালের ‘সাধারণী’ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ আমি সর্বস্তারে তুলে দিচ্ছি :

‘আমরা অদ্য বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর প্রজাদিগের প্রতি একটি বিশেষ কণ্ঠব্যক্তির উল্লেখ করিব।... ইহাদিগের শোণিতশোষী অনেকগুলি জলৌকা আছে। জমীদারের পর, পত্তনীদার দরপত্তনীদার নায়েব গোমস্তা প্রভৃতিতে ইহাদিগকে অনেক সময়ে সর্বস্বান্ত করিয়া থাকে।... গোলযোগের আশঙ্কায় ইহারা আপনাদিগের পিতল কাঁসা বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিয়া থাকে। এইপ্রকার তপস্বীদিগের প্রতি কি কেহই মনোযোগ বিধান করিবেন না? যাহারা অস্থিভেদী পরিশ্রম করিয়া পৃথিবীর উপকার সাধন করিতেছে; যাহারা সকলকে জীবনীশক্তি প্রদান করিতেছে, তাহারা চিরকালই এইরূপ পদদলিত হইতে থাকিবে?...

‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা জমীদারদিগের। জমীদারগণ, হয়ত স্বার্থহানির আশঙ্কায়, প্রজাদিগের প্রকৃত অবস্থা গবর্ণমেন্টে জ্ঞাপন করেন না। অধিক কি, ভারতবর্ষীয় সভার একজন প্রধান সভা ও একজন প্রধান জমীদারের এলাকাস্থ প্রজার প্রতি অত্যাচার কোন সম্বাদপত্রে আন্দোলিত হইয়াছিল। অতএব প্রস্তাবিত সভাতে যাহাতে স্বার্থপর জমীদারদিগের কোনরূপ সংস্রব না থাকে, তাহা একান্ত প্রার্থনীয়।

‘একবার জনরব উঠিয়াছিল, প্রসিদ্ধনামা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় এইরূপ একটি সভা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।’ (‘বঙ্গদেশের প্রজার জন্য কি কণ্ঠব্য’)

তারিখটা লক্ষ করুন : ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৮০, অর্থাৎ বিদ্যাসাগর তখন বেঁচে আছেন— প্রবল দাপটে বিরাজ করছেন, বলা উচিত। অথচ এ খবরের কোনও প্রতিবাদ ‘সাধারণী’র পাতায় বেরোয় নি। ‘সাধারণী’র চৌদ্দ-পনের মাস আগে (১৫ ভাদ্র ১২৭৯, ৩০ অগস্ট ১৮৭২) ‘এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বাতাবিহ’^৮ অনেকটা একই রিপোর্ট ছাপে। আর তারও কোনও প্রতিবাদ ‘এডুকেশন গেজেট’-এ বেরোয়নি। প্রতিবাদ তো কোথাও পাচ্ছি না বটেই, বরং ‘সাধারণী’র ওই প্রবন্ধের মাসাতিনেক আগে, ২৪ ভাদ্র ১২৮০, ‘সোমপ্রকাশ’ যা লেখে তাতে ‘এডুকেশন গেজেট’ আর ‘সাধারণী’র এই খবরের তিব্বক সমর্থনই হয়তো পেয়ে যাচ্ছি :

‘আমরা এস্থলে আর একটী প্রস্তাব করিতেছি আজিও কৃষকেরা যেরূপ অজ্ঞ আছে

তাহাতে তাহারা যে স্বরায় আপনাদের কণ্ঠ গবর্ণমেন্টের গোচর করিতে শিখিবে এরূপ আশা করা যায় না। অতএব দেশীয় কৃর্তাবিদ্যাদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃষকদিগের জন্য বাস্তবিক ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একটী সভা করিয়া সর্বদা কৃষকদিগের অভাব ও কষ্টের বিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর করেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। বর্তমান ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং হিন্দু পেট্রিয়ট জমিদারদিগের পক্ষে যেরূপ কার্য করিতেছেন যদি কৃষকদিগের পক্ষে সেরূপ কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে আজ অনেক অত্যাচার প্রকাশ হইয়া পড়িত ও তাহার নিবারণ হইত তাহার সন্দেহ নাই। শ্রমজীবী ও কৃষকশ্রেণীর উন্নতি না হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সমাজের মধ্যে অলস ও অকস্মাৎগেরা যতদিন পরিশ্রমী ও কর্ম্মিষ্ঠদিগের রক্তমাংসে প্রতিপালিত হইবে, যতদিন এই অধঃমার্চরণ প্রচলিত থাকিবে ততদিন দেশের ভদ্রস্থতা নাই।’ (‘উভয় সঙ্কট’)

অতএব, এই ‘জনরব’-কে নেহাৎ ভিত্তিহীন রটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া অসমীচীন। উড়িয়ে দেওয়া সমীচীন হবে না আরও এই কারণে যে কৃষকদের সংগঠিত করার আহ্বান জানিয়ে ‘সোমপ্রকাশ’-এর পাতায় আরও বহু লেখা বোরিয়েছিল; পরের উদ্ধৃতিগুরুত্বও সেই আহ্বানের কিছু প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে। আসলে, চাষী-মজুরের প্রতি বিদ্যাসাগরের মনোভাব কী ছিল, তা নিৰ্ণয়ের একটা পরোক্ষ উপকরণই হচ্ছে ‘সোমপ্রকাশ’।

বিদ্যাসাগর ছিলেন “‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার আদি-পরিচালক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা”।^৯ ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এর জবানবন্দি অনুযায়ী, ‘সোমপ্রকাশ’-এর প্রথম সংখ্যা স্বয়ং বিদ্যাসাগরেরই লেখা (এই সংখ্যাটি কোনোদিন পাওয়া গেলে তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক মতামতের প্রত্যক্ষ দলিল আমাদের হাতে আসবে)। তাছাড়া তিনি পরামর্শ দিয়ে ‘সোমপ্রকাশ’ সম্পাদনায় বিদ্যাভূষণ মশাইকে বিশেষ সাহায্য করতেন।^{১০} শুধু তা-ই নয়, ‘বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর পরেও, বিদ্যাসাগর এই পত্রিকার ট্রাস্টি নিযুক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, ‘সোমপ্রকাশ’-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। অতএব, এ-অনুমান যুক্তিসংগত : এই পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যের সঙ্গে তিনি মোটামুটি একমত ছিলেন। অন্ততঃ বিদ্যাসাগরের মেজাজ বা চারিত্র যতটা জানি, ‘সোমপ্রকাশ’-এর সঙ্গে তাঁর খুব গুরুত্বপূর্ণ মতান্তর ঘটলে, তিনি নিশ্চিত এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতেন। নানান সামাজিক প্রশ্নে কী ছিল ‘সোমপ্রকাশ’-এর অভিমত? এ-পত্রিকা কি চাষী-মজুরের স্বার্থের প্রতি ‘উদাসীন’ ছিল? ‘সোমপ্রকাশ’ শ্রেণীগত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বা বিভ্রমের বাইরে যেতে পারে নি ঠিকই; তবে এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে সেযুগে কৃষক-শ্রমিক-কুলিদের বড়ো বন্দু ছিল এই পত্রিকা। দেশী জমিদার আর বিদেশী নীলকর ও চা-করদের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ‘সোমপ্রকাশ’-এর ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ-সব বিষয়ে কী ধরনের মতামত ‘সোমপ্রকাশ’-এ ব্যক্ত হত, তার কিছু নমুনা এখানে দেওয়া যাক :

১. ‘“ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি” এই অশ্রুতপদার্থ শব্দগুণিল নিরন্তর আমাদের শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি এ-দেশীয়দিগের বিশেষতঃ কৃষক ও মজদুর-দিগের স্বাধীনতা লাভ চেষ্টার সহায় না হইয়া প্রত্যুত তাহাদিগকে দাসবৎ নিতান্ত পরাধীন করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতেছে, তাহারা ভারতবর্ষের কি প্রকার বন্ধু? কোন ব্যক্তি তাহাদের নিকট এ দেশের যথার্থ স্বাধীনতা, সৌভাগ্য ও সুখ সচ্ছন্দতা লাভ প্রত্যাশা করেন?...’

‘নীলকরের অত্যাচারে বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের রাজনীতি ও স্বাভাবিক স্বভাবের জ্ঞান জন্মিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহ ও তৎসম্বন্ধিত জাতিবৈর নিবন্ধন বঙ্গদেশ, উত্তম-পশ্চিম অঞ্চল, বোম্বাই ও মাদ্রাজবাসীরা পরস্পর পরস্পরকে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া ক্রমশ একতায় উন্মুখ হইতেছেন। এইরূপে ইঁহারা অধ্যবসায়রূঢ় হইলে রিডসডেল [গ্ল্যান্টার সায়েব] প্রভৃতি দুরাত্মার দৌরাণ্য নিবারণ কি দুরূহ হইবে?’ (‘আসামে চা-কর, হিন্দু পেট্রিয়ট ও ফিনিক্স’, ২৫ কার্তিক ১২৬৯)

২. ‘সম্প্রতি এদেশে ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতীকার চেষ্টাতেই সকলে ব্যস্ত সমস্ত আছেন। সুতরাং আমাদের দেশের জমীদার-দিগের পাপক্রিয়া ও অত্যাচারের প্রতি কেহ বড় দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। উহা এক্ষণে একপ্রকার আচ্ছন্ন হইয়া আছে।...অগ্রত্য অসং ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার ক্রমে-ক্রমে আর সকল অত্যাচারকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু পাঠকগণ! এরূপ অনুমান করিবেন না যে, এ-দেশের পুরাণ পাপীরা (জমীদারেরা) সকলেই সাধুশীল হইয়াছেন।

‘...দশ আইনে আছে, জমীদারেরা প্রজাগণকে আপন গৃহে ধরিয়া আনিয়া খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না। কিন্তু এরূপ অনেক জমীদার আছেন, তাঁহারা এই আইনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া প্রজাগণকে স্বগৃহে ধরিয়া আনিয়া যার পর নাই পীড়ন করিয়া থাকেন।...

‘জমীদারেরা কি চিরকাল অবিরোধিত রূপে এইরূপ অত্যাচার করিবেন? ইহার কি নিবারণের উপায় নাই?...রোমীয় পেট্রিসীয়দিগের গর্ব কিরূপে চূর্ণ হইয়াছিল? ফরাসী জমীদারেরা কৃষকদিগের নিকটে পরাস্ত হইয়াছিল কেন? কৃষকদিগের অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই কি তাহার কারণ নহে?’ (‘অত্যাচার বিষয়ে এদেশীয় জমীদারেরাও বড় কম নন’, ২০ শ্রাবণ ১২৬৯)

৩. ‘সর হিউ রোজ যথার্থই সৈন্য ও অফিসারদের অনুরোধ করিয়াছেন যে তাঁহারা একদিনের বেতন আলবট [মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী] স্মরণীয় ফন্ডের জন্য দেন। এ অনুরোধ করা অন্যায়, যদিও করা হইয়াছে, মাগেস্তেরের মজদুরদিগের নিমিত্ত করিলে ভাল হইত’। (৩ আষাঢ় ১২৬৯)

৪. ‘...আমাদের একান্ত অভিলাষ, রূপ গবর্ণমেন্ট যেমন জমিদারদিগকে ভূমির মূল্য

দিয়া প্রজার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টও ভারতবর্ষে তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করুন। প্রত্যেক ভূস্বামিকে তাঁহার জমিদারীর মূল্যস্বরূপ লাভের বিশ গুণ পণ প্রদত্ত হউক। ঐ পণের অর্দ্ধেক প্রজাগণ দিবে অর্দ্ধেক গবর্ণমেন্ট দিউন। প্রজারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করুক। ইহাতে মহোপকার সাধিত হইবে। কৃষকগণের গৃহে অর্থ সঞ্চিত হইবে, কদাচিৎ দুর্ভিক্ষের নাম শ্রুত হইবে না। তাহারা ক্রমে উন্নত হইয়া সমাজের পদস্থ লোক হইয়া উঠিবে। যে সমাজে অধিকসংখ্যক সচ্ছল লোকের বাস না থাকে, সে সমাজ উন্নত হয় না। এ দিকে জমিদারের হস্তে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হইবে, তাহারা নানা প্রকারে বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। গবর্ণমেন্টেরও রাজস্বের বিন্দু-পরিমিত ক্ষতি হইবে না, নিষ্কারিত কর দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে। অধিকন্তু একটী মহৎ পক্ষপাতও দেশ হইতে এককালে নিরাকৃত হইবে। কৃষকগণ সম্পূর্ণ শ্রম করিয়া বহুবিধ করভারে অবনত হইয়া পড়িতেছে পক্ষান্তরে জমিদারেরা আলস্যে কালক্ষেপ করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, কদাচিৎ তাহাদিগকে যৎসামান্য কর দিতে হয়। এই কুপ্রথাটী কোনক্রমে উপেক্ষণীয় নহে, আবহমান চলিয়া আসিতেছে, সে কারণ ইহাতে লোকের আশ্চর্য বোধ হয় না, নচেৎ এর্বিশ্ব নিন্দনীয় কুরীতি সভ্যসমাজে প্রচলিত থাকে, ইহা সামান্য অনুশোচনার বিষয় নহে।’ (‘ভারত সাম্রাজ্যের পরিণাম’, ৯ শ্রাবণ ১২৮৯)

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ‘সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র’-এর চতুর্থ খণ্ডে ‘সোমপ্রকাশ’-এর অনেক রচনা সংকলিত হয়েছে। অর্থনীতি বিষয়ে এর মোট ৫৫টি রচনার মধ্যে ২২টি কৃষক সম্পর্কিত আর ৮টির বিষয়বস্তু শ্রমিক ও কুলিদের সমস্যা। ‘সোমপ্রকাশ’-এ কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থের ওপর কতটা গুরুত্ব দেওয়া হত তার একটা মোটামুটি ধারণা এই হিসেব থেকে পাওয়া যাবে। অবশ্য এ হিসেব আংশিক; কারণ, ‘সোমপ্রকাশ’-এর অর্থনীতি-বিষয়ক যত লেখা এখনও পাওয়া যায়, তার সবগুলি বিনয়বাবুর এই বইয়ে নেওয়া হয় নি। যেমন, ওপরে উদ্ধৃত চারটি রচনার মধ্যে প্রথম, তৃতীয় আর চতুর্থটি স্থান পায় নি এ-সংকলনে।*

* আর চাষীরা কী চোখে দেখত ‘সোমপ্রকাশ’কে? ওরা যে ‘সোমপ্রকাশ’-এর ওপর কতটা ভরসা করত, তার একটি বিবরণ নথিভুক্ত হয়ে আছে বাহাদুরপুর গ্রামের ছজন সদগোপ চাষীর একটি চিঠিতে। সেই চিঠি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ তুলছি। এ চিঠিখানি বেরোয় ২৯ পৌষ ১২৭৫ তারিখের ‘সোমপ্রকাশ’-এ :

‘আজি আমাদের ধান্য জোক হইয়া বাড়ী নুট ফেসাং হইয়া গেল; আজি আমারদের জমির কৃত্রিম বিক্রয় কবলা প্রস্তুত হইয়া গেল; আজি আমারদের নামে মিথ্যা কর্জের খত প্রস্তুত হইল; আজি শুনলাম সমন আসিয়াছে। আজি শুনলাম ভিক্রিজারি হইয়াছে, কণেক পরেই আমারদিগের বাটী (এই ক্ষুদ্র ভগ্ন কুটীর) ছাড়া হইতে হইল!!! সম্পাদক মহাশয়! আমরা দীন হীন আমাদের সকল দিকেই বিপদ। ইহার কি উপায়ান্তর নাই? আমরা নিতান্ত দুঃখী আমাদের অর্থ নাই, লোকবল নাই, ভরসাও নাই, তবে দেখিতেছি যে মহাশয় একমাত্র ভরসাধার প।’

বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, “...‘হিন্দু পেট্রিট’-এর মতো ‘সোমপ্রকাশ’ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদের প্রশ্নে বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিল না’।^{১১} এই ধরনের মন্তব্য তিনি ঘুরে ফিরে এতবার করে ফেলেন যে বিলক্ষণ বোঝা যায় : একেবারে গোড়ায় গলদ ! আসলে, হরিশ মধুজের ‘হিন্দু পেট্রিট’ আর বিদ্যাভূষণের ‘সোমপ্রকাশ’—দুটো কাগজেরই—বিষয়ে ঠাঁর ধারণা বড়োই ঝাপসা ! নীলকরদের বিরুদ্ধে হরিশ মধুজ (১৮২৪-১৮৬১) ‘হিন্দু পেট্রিট’-এ যেভাবে কলম ধরেন, তার জন্যে তিনি চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন ; চাষীর, বিশেষতঃ নীলচাষীর প্রতি তাঁর উদ্যোগী দরদও নিশ্চয় চিরকাল স্মরণযোগ্য ; কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের দাবি তিনি আবার তুললেন কবে ? কেউ নীলপ্রথার বৈরী হলে, তিনি সে জমিদারপ্রথারও বৈরী হবেন, এইটে মোটেই স্বতঃসিদ্ধ নয়। এমনকি এইটেও স্বতঃসিদ্ধ নয় : কেউ জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরলে (হরিশ যেমন ধরেছিলেন) তিনি জমিদারপ্রথারও বৈরী হবেন।^{১২}

নানান ধরনের মানুষ এসে জড়ো হলেও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (প্রতিষ্ঠা কাল : অক্টোবর ১৮৫১) ছিল আদতে জমিদারসভা। ‘হিন্দু পেট্রিট’ (১৮৫৩) ক্রমে ক্রমে হয়ে দাঁড়ায় তার মধুপত্র। হরিশ মধুজ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন ১৮৫২ সালে। নীলমণি মধুখোপাধ্যায় তো লিখেছেন—কথাটা তাঁর আগে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও বলে গেছেন—কার্যতঃ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ছিল হরিশের ‘এম’প্লয়ার’ অর্থাৎ মনিব।^{১৩} ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্মের সঙ্গে হরিশ কতটা জড়িত ছিলেন, সে বিষয়ে, কপালগুণে, আমরা একজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর এজাহার পেয়ে যাচ্ছি। তিনি দীনবন্ধু মিত্র। ১৮৬২ সালের ২৬ জুলাই তারিখে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত এক স্মৃতিসভায় দীনবন্ধু বলেন, ‘কলিকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক্ষণে যে গৌরব দেখতেছেন, সে গৌরব হরিশচন্দ্রের লেখনীর জোরে হইয়াছে’ (‘সোমপ্রকাশ’, ১১ অগস্ট ১৮৬২, পৃ. ৪৭১)। নীলকরদের সঙ্গে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পর্ক যতই আদায় কাঁচকলায় হোক না কেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংকীর্ণ নৈতিক গাইতে এই জমিদারসভা কখনও পিছ-পা হয় নি। ‘হিন্দু পেট্রিট’-এর নীতিও ছিল মোটামুটি এই সুরেই বাঁধা। সেই কারণে ‘সোমপ্রকাশ’ লেখে, ‘...ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং হিন্দু পেট্রিট জমিদারদিগের পক্ষে ঘেরূপ কার্য করিতেছেন, যদি কৃষকদিগের পক্ষে সেরূপ কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে আজ অনেক অত্যাচার প্রকাশ হইয়া পড়িত...’ এই মন্তব্য ‘সোমপ্রকাশ’ করে ১৮৭৩ সালে। তার ঢের আগেও—খোদ হরিশ মধুজের আমলেও (১৮৫৩-৬১)^{১৪}—‘হিন্দু পেট্রিট’ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অবিরত সমর্থন জানায়। এখানে তার গোটা কয়েক উদাহরণ দেওয়াই যথেষ্ট হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ‘উচ্ছেদের প্রশ্নে’ ‘উৎসাহী’ হওয়া তো দূরে থাক, এই বন্দোবস্ত তুলে

দেবার তত্ত্বগত জন্মনাকেও ১৮৫৪ সালের ১৩ জুলাই তারিখে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়, ‘আবসাদ’। অর্থাৎ আজগুবি। প্রবন্ধটির নাম : ‘ইংলিশ স্ট্রাইক্‌স অ্যান্ড বেংগলি ধর্মঘটস’। লেখাটি সেকালে খুবই খ্যাতি লাভ করে। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এ তো লেখকের নাম থাকত না। তবে, ১৮৮৭ সালে জীবনীকার রামগোপাল সান্যাল মশাই বলে গেছেন, এ প্রবন্ধটির লেখক হচ্ছেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং।^{১৫} লেখার ভিতরকার নানান খুঁটিনাটি প্রমাণ থেকেও মনে হয়, এইটে খুব সম্ভব হরিশেরই লেখা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এর মূলে মনোভাব সুদ্রবন্ধ হয়ে আছে পয়লা জুন ১৮৫৪ সালের একটি প্রবন্ধের এই বয়ানে : ‘এই মহৎ বন্দোবস্ত [‘গ্রেট সেটলমেন্ট’]...ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে দেয় স্থিতি আর দেশকে দেয় শান্তি।’ এই মূলে ভাবনা পূর্ণতর রূপ নেয় ‘পারমানেন্ট সেটলমেন্ট’ শিরোনামায় মৃদুপ্রিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। সে লেখাটি বেরোয় সিপাহি বিদ্রোহের আগুন নেবার পরে, ১৮৫৮ সালের ২২ এপ্রিল তারিখে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এর ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠায়। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এ প্রবন্ধের লেখক হিসেবে হরিশকেই শনাক্ত করে গেছেন ; লেখাটি নিয়েওছেন হরিশের রচনাবলির সংকলনে। সমস্ত সম্পাদকীয় ওজন দিয়ে এই প্রবন্ধে বলা হল : ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যা-ই দোষত্রুটি থাক-না-কেন, কথাটা তো স্পষ্ট যে, এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী একমাত্র ভূমিব্যবস্থা। এরই আওতায় জনগণ প্রগতি আর সমৃদ্ধির মুখ দেখবে—তাদের সভ্যতা দৃষ্টিগ্রাহ্য অবয়ব নেবে ; কায়মি রাজশক্তির সঙ্গে তাদের হৃদয়তাও দৃঢ়নিষ্ঠ হয়ে উঠবে। [চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত]...জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষাকে লালনও করবে, চরিতার্থও করবে। প্রমাণিত হয়েছে : এই ভূমিব্যবস্থাই গবর্নমেন্টের সবচেয়ে বড়ো শক্তির উৎস এবং হিন্দুস্তানকে ব্রিটেনের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার দৃঢ়তম বাঁধন। এই সত্যটা তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করল সিপাহি বিদ্রোহ।...চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না-থাকলে, গোটা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিই ইংল্যান্ডের হাতছাড়া হয়ে যেত।’

আসলে, ভূমিসম্পর্ক নিয়ে কোনও নতুন আইনের প্রস্তাব উঠলে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ তার বিচার করত একটাই নিরিখে : প্রস্তাবিত ঐ আইন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কিছুমাত্র বদলায় কি না। সেই ‘মহৎ বন্দোবস্ত’-এর গায়ে আঁচড়টি কাটার জো নেই : যা কিছুর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিকূল, ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ তার পরিপন্থী। এই কারণে, কী ১৮৫৪ সালে, কী ১৮৫৭ সালে, সেল ল’-এর অদলবদল ঘটানোর কথা উঠলে, ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আবার, জমিদারদের ওপর যখনই প্রত্যক্ষ কর আরোপের প্রস্তাব আসে, ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ তখনই তারস্বরে প্রতিবাদ জানায় এই যুক্তিতে যে ঐ কর বসানোর মানেই হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে অগ্রাঘাত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একচুল হেরফের বরদাস্ত করতে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ একেবারেই নারাজ। তার কারণ হিসেবে সে বারবার জোর গলায় বলে,—যেমন, ১৩ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখের ‘আন্ডারটেনিওরস’ শিরোনামে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত তো শূন্য এক রাজস্ব-ব্যবস্থাই নয়, এ হল একটি রাজনৈতিক চুক্তি। সুতরাং সেই কন'ওয়ালিসি বন্দোবস্তের একটিল নড়চড়, আদতে, চুক্তিভঙ্গেরই অপরাধ। শূন্য চুক্তিই নয়, হয়তো আরও বেশি। তাই, একটু পরে, ওই একই প্রবন্ধে আরও এক ধাপ এগিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দাবি করল : জনকয়েক উন্মাদ ছাড়া আর সকলেই মানে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙালির স্বাধিকারের রক্ষাকবচ। একই স্বরে ১৮৫৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' আবার লেখে : 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙলা দেশকে দিয়েছে একটি ম্যাগনা কার্টা।'

এ তো গেল 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর কথা। এবার 'সোমপ্রকাশ'-এর প্রসঙ্গে আসি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ'-এর মনোভাব আরও অনেক জটিল। আরও জটিল, কারণ, প্রথমতঃ, এ বিষয়ে 'সোমপ্রকাশ'-এর মত এক বিন্দুতে স্থির থাকেনি ; কালক্রমে বদলেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, নানান সময়ে ভূমিসম্পর্ক নিয়ে 'সোমপ্রকাশ' যা যা বলল, তাতে কয়েক জায়গায় অসংগতিও দেখতে পাই। আসলে, এক মৌলিক অসংগতি ছিল সমাজের বাস্তবে—মূল উৎপাদন-সম্পর্কের একেবারে কেন্দ্রে। এ-গোষ্ঠী বা ও-গোষ্ঠী নয়, বাঙালি সমাজের কল্যাণকে সমগ্রতঃ—সব সময়—চোখের সামনে রাখব, এইটেই ছিল 'সোমপ্রকাশ'-এর দায়। স্বেচ্ছায় বেছে-নেওয়া এক আম্পায়ার বা মধ্যস্থের ভূমিকা ! কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নে—বিশেষতঃ খাজনাবৃদ্ধি আর জমির মালিকানার প্রশ্নে—একদিকে ভূমিস্বত্বজীবীর, অন্যদিকে চাষীর, যে-মূল অবস্থান, সেটা এতই আড়াআড়ির, যে, তার মধ্যে কোনও মোলায়েম সমন্বয়-তৈরির আর বড়ো-একটা জায়গা ছিল না। মূলখোঁদে দুই বৈরী শিবির : আর, এই আপসনিষ্পত্তিহীন বন্দুক্ষেত্রে এক মধ্যস্থের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে 'সোমপ্রকাশ' যতই সালিশরফার চেষ্টা করছে, কেন্দ্রীয় উৎপাদন-সম্পর্কের সেই মূলগত অসংগতি ততই ফেটে ফেটে বেরুচ্ছে। প্রায়-অনিবার্যতঃ 'সোমপ্রকাশ'-এর মতামতেও বারবার দেখা দিচ্ছে বিপরীত চাপ, টানাপোড়েন, অসংগতি। এখানে তার একটাই উদাহরণ দেব। একই বাঙলা সালের—১২৭৮ বঙ্গাব্দের—দুটো প্রবন্ধ। ১২ বৈশাখ ১২৭৮ সালের সম্পাদকীয়টি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থনে লেখা। সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে গজিয়ে-ওঠা 'প্রজা ও জমিদারের মধ্যবর্তী পত্তনদার, দরপত্তনদার মোকররদার আয়মাদার' ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীর স্তুতিকীর্তন করছে 'সোমপ্রকাশ' ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শিক্ষা ও রথ্যা কর এবং বৃটিশ জাতির প্রতিজ্ঞা ভংগ')। আবার ঐ বছরেরই শেষের দিকে, ১ই মাঘের, সম্পাদকীয়তে এই সব মধ্যস্বত্বজীবী জমির জোঁকের উচ্ছেদ চেয়ে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছে : 'অনেকবার এই সোমপ্রকাশে এগুনি রহিত করিবার এক বিধি-বিধানের অনুরোধ করা হইয়াছে' ('দুরাত্মা জমিদারদিগের হস্ত রোধ করিবার একটি উপায় করা আবশ্যক')।

'সোমপ্রকাশ'-এর এই দৃষ্টিভ্রম আর অসংগতি তো নিরেট সত্যি ; সেটা না-মানার জো নেই। এই সত্যটুকু পুরোপুরি কবুল করে নিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে বিদ্যা-

ভূষণের কতকগুলি মূল বস্তু এবং তার কালক্রমিক বিবর্তন 'সোমপ্রকাশ'-এর ফাইল থেকে হয়তো ছেঁকে বার করে আনা যায়।

প্রথম কথাটা এই যে, সন্দেহ নেই, 'সোমপ্রকাশ' বহুদিন অবাধ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে মেনে নেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্বাদে দেশের 'সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি' ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', ১৮ অগস্ট ১৮৬২, পৃ. ৪৮০-৪৮১) হচ্ছে এবং হবে, এরকম জয়ধ্বনিও 'সোমপ্রকাশ' মাঝে মাঝে দিচ্ছে। এমনকি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সঙ্গে প্রায় গলা মিলিয়ে কখনও-বা বলে উঠছে, জমিদারের ওপর শিক্ষা-কর, রাস্তা-কর বসানো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী; সুতরাং সেটা ইংরেজের পক্ষে কথার খেলাপ। অর্থাৎ সেই আদম চন্দ্রভট্টগের অপরাধ ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শিক্ষা ও রথ্যা কর এবং বৃটিশ জাতির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ', 'সোমপ্রকাশ', ১২ বৈশাখ ১২৭৮) ! তবু তালিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে বুঝতে পারি, একথাও সত্য : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে গ্রহণের পাশাপাশি একটি সমালোচনাও গড়ে তুলছিল 'সোমপ্রকাশ' * ; অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে এই সমর্থন মোটেই অকুণ্ঠও নয়, নিঃশর্তও নয়। প্রথম সমালোচনা বা শর্তটা কী? 'সোমপ্রকাশ'-এর নিজের বয়ান তুলেই জবাব দেব : 'আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষতা করিতোঁছি বটে, কিন্তু আমরা বঙ্গদেশের বন্দোবস্তের সপক্ষ নহি। এবন্দোবস্তের একটি মহান দোষ আছে। এতদ্বারা জমিদারদিগেরই হস্তে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কৃষকদিগের স্বত্ব ও অধিকারের বিষয়ে তাদৃশ যত্ন করা হয় নাই' ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', 'সোমপ্রকাশ', ১৮ অগস্ট ১৮৬২)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে 'সোমপ্রকাশ' সমর্থন করেছিল আরেকটি শর্ত জুড়ে দিয়ে : জমিদার যা রাজস্ব দেবে, সেটা যেমন গবর্নমেন্ট চিরকালের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, জমিদারকে চাষী যে-খাজনা দেবে, সেটাও তেমন সর্বকালের জন্যে বেঁধে দেওয়া হোক। একেই বিদ্যভূষণ স্লেগানের মতন করে বলতেন : 'প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত !' সেই ১৮৬২ সাল থেকে ভূমিসম্পর্ক নিয়ে এই এক মূল নীতি বরাবর প্রচার করে

* অনেক আগে, ১৮৪৮ সালে, 'বঙ্গালার ইতিহাস'-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের যে-মনোভাব পাচ্ছি, তার সঙ্গে 'সোমপ্রকাশ'-এর এই মনোভাবের খানিকটা মিল আছে। রাজস্ব বেঁধে দেওয়ার জন্তে দেশের মঙ্গল হয়েছে, এই কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করলেও, বিদ্যাসাগর তার দুটো খুঁত দেখাচ্ছেন : 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে, বঙ্গালা দেশের যে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।' এতদ্বা না হইয়া, যদি পূর্বের স্থায় রাজস্ব বিষয়ে নিত্য নূতন পরিবর্তের প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে, এ দেশের কখনই মঙ্গল হইত না। কিন্তু ইহাতে দুই অমঙ্গল ঘটয়াছে ; প্রথম এই যে, ভূমি ও ভূমির মূল্য নিশ্চিত না জানিয়া, বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ; তাহাতে কোনও কোনও ভূমিতে অত্যন্ত অধিক, কোনও কোনও ভূমিতে অতি সামান্য, কর নির্ধারিত হইয়াছে ; দ্বিতীয় এই যে, সমুদয় ভূমি যখন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া গেল, তখন যে সকল প্রজারা আবাদ করিয়া, চির কাল, ভূমির উপযুক্ত ভোগ করিয়া আসিতেছিল, নূতন ভূমিধিকারিগণের স্বেচ্ছাচার হইতে তাহাদের পরিত্রাণের কোনও বিশিষ্ট উপায় নির্দিষ্ট করা হয় নাই।' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বঙ্গালার ইতিহাস', দ্বিতীয় ভাগ, পঞ্চবিংশ সংস্করণ, কলকাতা, ১৮৮৩, পৃ. ১২৩-২৪।

গেছে ‘সোমপ্রকাশ’ ; কখনও সে-নীতি থেকে একচুল নড়ে নি। ‘প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ ঠিক এই নামেই এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ‘সোমপ্রকাশ’ (১৫ জুলাই ১৮৭৮) লেখে : ‘...আমরা...জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া বহুদিন অবধি প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। ...আমাদিগের অভিমত স্থায়ী বন্দোবস্ত। আমাদিগের মতে সেই বন্দোবস্ত এরূপ হওয়া উচিত যে সেই বন্দোবস্তের ভূমি সকল দান বা বিক্রয়াদির দ্বারা প্রজারা কোনরূপে হস্তান্তর করিতে না পারে। জমিদার সেই ভূমির উপস্বত্ব হইতে আপনার প্রাপ্য খাজনা আদায় করিবেন কিন্তু জমী কোন ক্রমে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। মহাজনের দেনায়ও উহা বিক্রয় হইবে না। কেবল দখলী স্বত্ববান প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করা আমাদিগের অভিমত নহে। যাবতীয় ঠিকা প্রজা ও যাহাদিগের জমি সম্পর্ক নাই তাহারা যদি জমী গ্রহণার্থী হয় সেই সমুদয় প্রজাকে লইয়া এই বন্দোবস্ত করা আমাদিগের অভিপ্রেত। তাহা হইলেই আমরা যে উদ্দেশ্যে এই স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি তাহা প্রকৃত রূপে সন্নিবিষ্ট হইবে’ (‘প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’, ১৫ জুলাই ১৮৭৮)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আরও একটা সমালোচনা থেকে ‘সোমপ্রকাশ’ এক পা সরে নি : লর্ড কন’ওয়ালিস জমির মালিক ঠিক করতে গিয়ে বেবাক ভুল করে বসেন। ‘সোমপ্রকাশ’ বলে : ‘উক্ত লর্ড [অর্থাৎ কন’ওয়ালিস] কৃষকদিগকে উপেক্ষা করিয়া যদি জমীদার-দিগের হস্তে সর্বস্ব প্রভুতা প্রদান না করিতেন, তিনি ভূমির প্রকৃত স্বামীর আবিষ্করণে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতাম’ (‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’, ১৮ অগস্ট ১৮৬২)। জমির মালিক কে ? এ প্রশ্নে ‘সোমপ্রকাশ’-এর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সে নিঃস্বার্থ একবাক্যে রায় দিয়েছে : ‘কৃষকেরাই ভূমির যথার্থ অধিকারী’ (‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’, ১৮ অগস্ট ১৮৬২)। নিঃসংশয়ে, শাদা কথায় জানিয়েছে : ‘আমরা জমীদারকে প্রকৃত ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করি না’ (‘প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’, ১৫ জুলাই ১৮৭৮)। ঠিক এখানেই হরিশ মুখার্জির ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এর সঙ্গে তার মৌলিক তফাৎ। একেবারে এর বিপরীত মেরুতে খাড়া দাঁড়িয়ে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ জোর গলায় হরদম বলে গেছে : কোনও প্রশ্নই নেই, চাষী নয় ; জমির একচ্ছত্র মালিক হচ্ছে জমিদার।^{১৬}

চাষীই জমির মালিক—এই প্রতিপাদ্যকে যুক্তিতথ্যের মারফৎ ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে ‘সোমপ্রকাশ’ বলল : ‘কৃষকদিগের ভূমিতে আপনার বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে যে, কি মহা লাভ হয়, তাহা আমেরিকা ও ইউরোপ খণ্ডের যে যে প্রদেশে কৃষকদিগের স্থায়ী স্বত্ব ও কৃষকাদিকার প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের কৃষিকার্যের উন্নতি দর্শন করিলেই বিদিত হইবে’ (‘জমীদার ও কৃষকের খাজনা ঘটিত বিবাদের মূল উৎপাতন করিবার উপায় কি ?’ ১৪ মার্চ ১৮৮১)। কম্বর্ল্যান্ড, ওয়েস্টমরল্যান্ড, স্টুইজার-ল্যান্ড, নরওয়ে, ইংলিশ চ্যানেল-এর গার্লিস দ্বীপ—এইরকম আরও নানান অঞ্চলের,

পর-পর দৃষ্টান্ত দিয়ে ‘সোমপ্রকাশ’ তন্ন তন্ন করে দেখাল : যেখানেই জমির মালিক চাষী, সেখানেই জমির ফলনও বেশি, চাষীও স্বচ্ছল।

দেখলুম : বহু দিন অবধি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ‘সোমপ্রকাশ’ সমর্থন জুগিয়েছে ঠিকই ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার একটি সমালোচনাও রচনা করে চলেছে। যার প্রধান কথা হচ্ছে : প্রথমতঃ, বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে-আকারে চালু হল তার মস্ত দোষ এই যে সেখানে চাষীর অধিকার আর স্বত্বের ওপর নজরই পড়ল না। দ্বিতীয়তঃ, ‘সোমপ্রকাশ’ দাবি তুলল : চাষীর সঙ্গেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোক। তৃতীয়তঃ, ‘সোমপ্রকাশ’ বলল : জমিদারকে জমির মালিকানা দিয়ে লর্ড কনওয়ালিস গোড়ায় গলদ করে বসেছেন ; জমির আসল মালিক হচ্ছে চাষী। এই-যে তিনটে মূল বক্তব্য, এদের একটি সূত্রের মতন গেঁথে রেখেছে একটি বোধ : চাষীকে সম্মান-দেওয়ার ইমান। আর এই অবস্থান থেকেই পায়ে পায়ে এগিয়ে, শেষ অবধি, একটা সময়ে এসে ‘সোমপ্রকাশ’ চাইল : ক্ষতিপূরণ দিয়ে তুলে দাও ঐ জমিদার-প্রথা ! চাষীকেই দাও জমির মালিকানা ! এই ভাবনার একটি স্পষ্ট বয়ান পেয়ে যাচ্ছি বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর চার বছর আগে—১৮৮২ সালের ২৪ জুলাই তারিখে—মুদ্রিত তাঁর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। তার নাম : ‘ভারতসাম্রাজ্যের পরিণাম’। যেখানে বিদ্যাভূষণ সোজাসুজি বলছেন : ‘কৃষকগণ সম্পূর্ণ শ্রম করিয়া বহুবিধ করভারে অবনত হইয়া পড়িতেছে পক্ষান্তরে জমিদারেরা আসল কালক্ষেপ করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, কচিং তাহা-দিগকে যৎসামান্য কর দিতে হয়। এই কুপ্রথাটি কোন ক্রমে উপেক্ষণীয় নহে, আবহমান চলিয়া আসিতেছে, সে কারণ ইহাতে লোকের আশ্চর্য্য বোধ হয় না, নচেৎ এবশিষ্য নিন্দনীয় কুরীতি সভ্যসমাজে প্রচলিত থাকে, ইহা সামান্য অনুশোচনার বিষয় নহে।’ আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে বিদ্যাভূষণের এই সম্পাদকীয় বিশেষ মর্যাদা পাবার যোগ্য। সংগত ভূমিনীতির স্পষ্ট বয়ানের দিকে এ লেখাটি এক জোরাল পদক্ষেপ। এ লেখাতেই ‘সোমপ্রকাশ’ দাবি তুলল : ‘প্রজারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করুক’ ! বিদ্যাসাগর যে - নীতির ওপর, শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে, বর্ধমান-মহারাজের দেওয়া বীরসিংহের সেই পূর্তন প্রত্যাখ্যান করেন, তার সঙ্গে ‘সোমপ্রকাশ’-এর এই সূতীক্ষ্ণ দাবির অন্তর্যোগ তো আমি এ আলোচনার শুরুরূতেই দেখিয়েছি।

তিন

বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, “‘হিন্দু পেট্রিট’-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র যেভাবে নির্যাতিত কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তা কোনদিন চিন্তাও করেননি।”^{১৭} চিন্তাও করেন নি কোনও দিন ? ঐতিহাসিক তথ্য কিন্তু অন্যরকম। হরিশচন্দ্র মদুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে ‘হিন্দু পেট্রিট’ চালানোর ভার বিদ্যাসাগরের হাতে আসে। সম্পাদকের কাজে তিনিই কৃষ্ণদাস পালকে বহাল করেছিলেন ; কৃষ্ণদাসকে দিয়ে পছন্দমাত্রিক প্রবন্ধও লিখিয়ে নিতেন তিনি। বিদ্যাসাগরের ‘হিন্দু পেট্রিট’ নীলদু-

বান্দরদের চাবকাতে কিছুমাত্র কসদুর করেনি। ১৮৬১ সালের ২ ডিসেম্বর ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এ এই বিজ্ঞাপ্তি বেরিয়েছিল যে অতঃপর সমস্ত রচনা বিদ্যাসাগরের বা সম্পাদকের কাছে পাঠাতে হবে। আর ঐ তারিখের কাগজেই সম্পাদকীয় নীতিঘোষণার সূত্রে যা বলা হল তার সারাংশ এই : ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ কোটি কোটি জনগণের মুখপত্র হিশেবে কাজ করে যাবে ; ব্যস্ত করবে, কায়েম করবে দেশবাসীর স্বার্থ আর অধিকার। আর অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে এই পত্রিকা হরিশ্চন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।* নীতির এই বয়ান যদিবা স্বয়ং বিদ্যাসাগরের না-ও হয়, তাঁর নির্দেশে, অনুমোদনে লেখা—একথা নিশ্চিত।

অমল হোমের ‘কেরানী রবীন্দ্রনাথ’-এর আদলে কৃষক বিদ্যাসাগরের চোখ-বালসানো নতুন প্রতিমা খাড়া করবার বাসনা আমার নেই, কৃষি-বিপ্লবের নবী রূপে তাঁকে হাজির করা তো দূরস্থান। আল্লার প্রতিপাদ্য শব্দ এইটুকু : বিদ্যাসাগর কৃষকসমাজের সুখ-দুঃখের প্রতি ‘সম্পূর্ণ উদাসীন’ ছিলেন, এই পাইকারি ফতোয়ার পেছনে না-আছে যুক্তি, না-আছে তথ্য। হিন্দু শাস্ত্রে বলে, সংসারটা নাকি আদৌ জন্মিতে বন্ধমূল নয়, শুন্যে দুল্যমান। বদরুদ্দীন উমরের মতন মাক্সবাদী লেখকের হাতে ইতিহাসবিদ্যাটা যদি এরকম মেটাফিজিক্যাল অর্থাৎ উদ্ভ্রমূল অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠে, তবে, অন্যে পরে কা কথা !

চার

শব্দ ইতিহাস নয়, তাঁর মাক্সবাদ প্রয়োগের ধরণটাও মেটাফিজিক্যাল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর কেন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামেন নি, এটাই হয়তো বদরুদ্দীন উমরের আসল অভিযোগ। কিন্তু বিদ্যাসাগর কেন মাও হলেন না—এ আক্ষেপ অবান্তর।

কথাটা কান্ডজ্ঞানের : সমস্ত মানুষকে কি একই কাঁটায় ওজন করা যায় ? ইতিহাসের ব্যক্তিবিশেষকে বিচারের আগে তো তাঁকে বোঝা চাই ? কী করে সেই ব্যক্তিকে বুঝব, যদি-না তলিয়ে দেখি : ওঁর কাজের সেই বিশেষ ক্ষেত্রটা কী ?

মানুষের সামাজিক অস্তিত্বকে কয়েকটি পৃথক এলাকায়, স্তরে, ভাগ করে দেখতে পারি। তার একটি হল সরকারি সমাজ, রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র। অন্য এক এলাকাকে মাক্স বলতেন ‘গেমাইন্সশাফ্ট’। সমাজবিজ্ঞানের ইংরেজি পরিভাষায় একে বলে ‘কমিউনিটি’। এর তজমা করতে পারি ‘কোম’। আবার—একটু ব্যাপক হলেও—

* ‘A word about our policy. We will unflinchingly assert native rights and advocate native interests, and so far we will continue [as] a party organ, that is, an organ of the millions, a privilege, however, which under ordinary circumstances seldom falls to the lot of a journalist. In all other respects, we will endeavour to tread in the footsteps of the illustrious dead, who founded and wielded with such great mastery and honour this new power in the realm...’

বাঙলায় এর আর-একটা নামও দেওয়া যায় : ‘রাষ্ট্রেতর সমাজ’ বা ‘বেসরকারি সমাজ’।^{১৮} প্রথম এলাকাটি আমলাসংকুল, ফৌজ-পুলিশের দাঁতে-নখে সাজানো শাসনিক ইম্পাত-যন্ত্রের এস্তিয়ারভুক্ত। দ্বিতীয় এলাকায় পড়ে সরকারবাহাদুর নামক ঐ মহাকায় যন্ত্রের চৌহদ্দির বাইরেকার এক আবহমানের সাধারণ্য, কৃষকসমাজ যার অন্তঃসার। এই দ্বিতীয় এলাকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের অনেকটা মিল আছে। তাঁর আত্মশক্তি চর্চার কর্মসূচি বা স্বদেশী সমাজের কার্যক্রমের তাৎপর্য বন্ধুতে এই বেসরকারি সমাজের ধারণা আমাদের সাহায্য করবে। সরকারি সমাজ আর বেসরকারি সমাজ—এই দুই এলাকার সম্পর্ক কীরকম পিঠোপিঠি তা বোঝানো যায় একটি উপমা দিয়ে। ধূতি-শাড়ির বাইরের পিঠকে বলে সদর; মফস্বল বলে অন্তরঙ্গ ভিতরের পিঠকে। এ উপমার ভাষায় সমাজের ওই প্রথম এলাকাটিকে যদি তার সদর বলি, দ্বিতীয় এলাকাটিকে বলব তার মফস্বল। বিদ্যাসাগরের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ছিল রাজনৈতিক বা সরকারি সমাজ নয়; ওই বেসরকারি সমাজ। সমাজের সদর নয়; মফস্বল। অতএব বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন করতে হবে তাঁর এই স্বক্ষেত্রে; বাইরের কোনও দেশকাল-বিবিক্ত প্রতিমান-প্রয়োগ শূন্য অবাস্তব নয়, সেও এক ধরনের মেটাফিজিক্স বিলাস।

এইটে একটা প্যারাডক্স : যে-বিদ্যাসাগর এনলাইটেনমেন্ট-এর ভাবধারায় এত সম্পৃক্ত আর সিভিল সোসাইটি বা পৌর সমাজের চৌহদ্দিতেও যিনি এত কিছু করেছেন, সেই মানুষেরই কোমের এলাকায় কাজ, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অর্থে, হয়তো সবচেয়ে তাৎপর্যময়। এখন এই প্যারাডক্সের নিহিত সত্যটুকু বন্ধু নেবার চেষ্টা করব।

শূন্য পৌর সমাজের সঙ্গেই বা কেন, খাশ সরকারি সমাজের সঙ্গেও তাঁর যোগের কথা এই সূত্রে তো উঠতেই পারে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাঙলা বিভাগের সেরেস্তাদারিকে হিশেবের মধ্যে ধরলে বিদ্যাসাগর মোট সতের বছর সরকারি চাকরি করেছেন, ঠিকই; বিধবাবিবাহের বা শিক্ষাবিস্তারের মতন আর-পাঁচটা কাজের গরজে তিনি যে সরকারি সাহায্য নিয়েছেন, এইটেও তথ্য হিশেবে ঠিক। কিন্তু তাঁর সমস্ত উদ্যোগের কেন্দ্র ছিল ঐ বেসরকারি সমাজ, ঐ কোম। শান্তিপুত্রের তাঁতরা কাপড়ের পাড়ে বুনে বুনেনে লিখতেন, ‘বে’চে থাকো বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে/সদরে করেছ রিপোর্ট’, বিধবাদের হবে বিয়ে’। ঐ আশীর্বাদের ভাষা একটু বদল করে বলা যায় : বিদ্যাসাগর সদরে রিপোর্ট করেছেন বারবার; কিন্তু করেছেন মফস্বলের হয়ে।

যুক্তিটা আরও খুলে বলার জন্যে, যেসব তথ্য একটু আগে পেশ করেছি, তার সারমর্ম এখানে, আরেকবার, ঝালিয়ে নেওয়া ভালো।

বিদ্যাসাগর এবং চাষী : এই সম্বন্ধপাত, বোধ করি, ঈষৎ অতর্কিত। কী সেই সম্বন্ধ? উনিশ শতকের উপন্যাসে যেমন, বিদ্যাসাগরের চরিত্রকথাতেও তেমন, চাষী কি সেই ফেরারি প্রোটোগানিস্ট? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই গোড়াতে তর্কবিচার-কণ্টকিত এক প্রস্থ পথ পায়ে পায়ে পেরিয়ে এলুম। বিদ্যাসাগর আর বিদ্যাভূষণ—এঁরা একে অন্যের প্রতিবিম্ব নন; কিন্তু আমরণ এক ধরনের সাযুজ্য ছিল এঁদের দুজনের ভুবনে।

‘সোমপ্রকাশ’-এর প্রকল্প বলতে বুদ্ধি : এক বেসরকারি অথচ সাধারণের ফোরাম, যেখানে একটি সমগ্র কৌমের মধ্যে, ওরই ঘরোয়া সমস্যা আর দাবিদাওয়া নিয়ে, যুক্তি তথ্য বোধ দিয়ে—মাতৃভাষায়—মত দেওয়া-নেওয়া চলবে ; চলবে এক অবিচ্ছিন্ন সংলাপ। যে-আত্মীয় সমাজের নাম কৌম, সেটি না-থাকলে এইরকমের সংলাপ জন্মে না ; আবার, এইরকম সংলাপ না-জন্মে উঠলে, কৌমের ঐ মৌচাকও বাঁধা যায় না। আর এখানেই হরিশের ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এর সঙ্গে ‘সোমপ্রকাশ’-এর আরেক তফাৎ। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ কখনো তর্ক, কখনো আর্জি পেশ করতে মূলতঃ সরকারি সমাজের সায়েবসুবার কাছে। অন্য পক্ষে ‘সোমপ্রকাশ’-এর যত কথা আর বার্তা, সবই, মূলতঃ নিজের কৌমের সঙ্গে। প্রতিটি বেরুতও সদর নয়, চাঙাড়িপোতার সেই মফস্বল থেকে। যাকে একালের কথাসিঁপী বলেন ‘মফস্বল বৃত্তান্ত’, সেটা অনেকখানি জায়গাও জুড়ে নেয় ‘সোমপ্রকাশ’-এর পাতায়। আর, ‘সোমপ্রকাশ’কে ধারণ করে রেখেছিল : চাষীকে সম্মান-দেওয়ার ইমান। কমটিাড়ে সাঁওতাল চাষীদের মধ্যে জীবনের শেষ পর্বে বিদ্যাসাগরের বাসা-বাঁধার যে-আখ্যানকে বিষ্ণু দে বলেছিলেন ‘ঐতিহাসিক রূপক’, তাকে যদি এই ‘সোমপ্রকাশ’-প্রকল্পের ঠিক পাশাপাশি রাখি, তাহলে, অনিবার্যভাবে এক নিগূঢ় স্বদেশের মধুমুখি দাঁড়িয়ে যাই আমরা : বিদ্যাসাগরের ভুবনে চাষী গায়েব এবং হাজির ; অথবা, সেই ভুবনে চাষী হাজির এবং গায়েব।

কৃষকশোষণের মূল্যে খাজনাজীবী পত্তনদার হতে সটান নারাজ হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি দুর্ভিক্ষে মহামারীতে চাষীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আর, এই ‘জনরব’টিও ইঙ্গিতময় : কত আগে, চাষীদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তৈরি হয়েছিলেন তিনি ! এসব হল ওই কৌম, ওই বেসরকারি সমাজের সঙ্গে তাঁর সাধুজ্যবোধের একটা দিক।

এরই আর-এক দিক : মেয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, মেয়েদের প্রতি তাঁর মনোভাব।* কৌমের অন্তঃসার যেমন চাষী ; তার স্নায়ুকেন্দ্র তেমন নারীসমাজ। মেয়েদের ওপর কোনও মার, তাই গোটা কৌমেরই স্নায়ুমূলে গিয়ে ঘা মারে। রত পালপার্বণ রূপকথা ছড়া প্রবাদপ্রবচনের মধ্যে কৌমমনের যে-প্রবাহ লক্ষ্য করি, তাকে তো ধারণ করে রাখে মেয়েরাই।

এদেশের নারীসমাজের যে-তিন প্রতিনিধির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অন্তরতম সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, তাঁরা হলেন : ভগবতী, রাইমণি আর প্রভাবতী। মায়ের সঙ্গে, ভগবতীর সঙ্গে, তাঁর সম্বন্ধের কাহিনী তো আজ বাঙালির আধুনিক পুরাণের শামিল হতে চলেছে। রাইমণির প্রসঙ্গে তিনি নিজেই আত্মচারিতে লিখেছেন : ‘আমি স্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদগুণের

* চাষী আর নারী - সমাজ মোটেও বিচ্ছিন্ন নয়। এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়, প্রকৃত্তি আর নৃতত্ত্বের সাক্ষ্য অনুযায়ী, লাঙল আধিকারের আগে মেয়েরাই ছিল আদিম চাষী।

ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃত্রিম পামর ভ্রমণ্ডলে নাই।^{১৯} যাকে বিদ্যাসাগর এখানে মিতভাষণে ‘পক্ষপাত’ বলছেন, তাকেই আমি বলব : ঐকাত্ম্য। (এই সত্যটুকু লক্ষ্য করেছিলেন মাইকেল, যেজন্যে তিনি এই একই কথা একটু অন্য ভাষায় বলেছিলেন—বিদ্যাসাগরের হৃদয়টা ছিল ‘বাঙালি ঘায়ের’।) না, শূদ্ধ ‘পক্ষপাতী’ নয় ; মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি ছিলেন এক-হৃদয়। তাই মেয়েদের বন্দনা আদপে সইতেই পারতেন না তিনি ; তাঁর প্রতিক্রিয়া হত শারীরিক।

এবার, প্রভাবতীর প্রসঙ্গে আসি। সে ঔর বন্ধুর মেয়ে। ঔর চোখের মণি। মাত্র তিন বছর বয়সে সে মারা যায়। তার উদ্দেশ্যে ‘প্রভাবতীসম্ভাষণ’^{২০} নামে শ্বাসরোধক শোক-থেকে-উৎসারিত এক স্বগত সংলাপ লেখেন বিদ্যাসাগর।

‘স্বগত’ না বলে, ‘নিঃসঙ্গ সংলাপ’ বলাই, বোধহয়, আরও নিভুল। কারণ তিনি তো নিজের সঙ্গে কথা বলছেন না এখানে ; বলছেন এমন একজনের সঙ্গে, যে আর নেই ; যে উত্তরও দেবে না কোনও দিন। এ যেন নিরন্তর ও অদৃশ্য ঈশ্বরের সঙ্গে কথা-বলা। গোন্ডমান লিখেছেন, এই-যে নিঃসঙ্গ সংলাপ, এইটে ট্রাজিক মানুষ্যের নিয়তি।^{২১} সেই তীর, একান্ত ব্যক্তিগত গদ্য ছাপা হয় তাঁর মৃত্যুর পরে, ১৮৯২ সালে। শূদ্ধ এই ‘প্রভাবতীসম্ভাষণ’ পড়লেই বৃষ্ণতে পারি, কী নিখাদ ঐকাত্ম্যে, কত কান পেতে তিনি মেয়েদের মূখের ভাষা শুনিয়েছিলেন !

গদ্যরীতিতে সংস্কৃত ঝোঁকের মস্ত নায়ক হিশেবে বিদ্যাসাগরকে শনাক্ত করার ঢালাও এক রেওয়াজ আছে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে। আজ বলার সময় এল : বিদ্যাসাগরের এই পরিচয় বড়ো জোর অধিক সত্য। কোনও সন্দেহ নেই, মেয়েদের মূখের ভাষা আর ছন্দ ঔর গদ্যের একটি প্রধান শিকড়।* এমন নয় যে সেই শিকড় থেকে বিদ্যাসাগর তাঁর রসদ শুষে নিয়েছিলেন শূদ্ধই সম্ভানে, সচেতন প্রক্রিয়ায়। চৈতন্যের সঙ্গে ভাষার সংযোগের কথা তো আমরা বহু দিন থেকেই জানি। আধুনিক মনোবিজ্ঞান দেখাল, ভাষার সঙ্গে অচেতনের যোগ কত গহন আর গভীর। হতেই পারে, মেয়েদের ভাষা আর ছন্দ চারিয়ে গিয়েছিল তাঁর মনের অন্তস্তলে, অচেতন স্তরে।

মেয়েদের ভাষা তিনি যে শূদ্ধ নিয়েছিলেন, তা-ই নয় ; স্বভাষা হয়তো আবার ফিরে পাঠিয়েও দিয়েছিলেন মেয়েদের মহলে। হয়তো এইভাবে মেয়ে-সমাজের সঙ্গে ভাষা নেওয়া-দেওয়ার একটি বৃত্ত তৈরি করতে পেরেছিলেন তিনি। তার এক ধরনের সাক্ষ্য রয়ে গেছে আমাদের সাহিত্যে। যেমন, ‘নীলদর্পণ’-এর এই সংলাপ : ‘ছোট বউ বসিস, আমি আস্চি, বিদ্যাসাগরের “বেতাল” শুনবো।’^{২২}

বিদ্যাসাগরের প্রথম বই ‘বেতালপঞ্চাংশতি’ বেরোর ১৮৪৭ সালে আর দীনবন্ধুর ‘নীল-

* পরে আরও উদাহরণ দেব। এখানে একটাই নমুনা তুলছি ‘ব্রাহ্মবিলাস’ থেকে : ‘তুই কোথাকার হতভাগা, দুঃ হয়ে বা, দরজার কাছে গোল করিস না, লক্ষ্মীছাড়ার আশ্পদা দেখ না...’^{২২}

দর্পণ' বেরদুনার তারিখ হল ১৮৬০। ইন্দুমিত্রের ভাষায় বলতে পারি, ওপরের এই সংলাপ থেকে এ 'ধারণা প্রশ্ন' ২৪ পায় : ছেপে বেরদুনার তের বছরের মধ্যে বিদ্যাসাগরের 'বেতাল' হয়তো গ্রামের মেয়েমহলেও পৌঁছে গিয়েছিল।

ভাষার মারফৎ গ্রামের মেয়ে-সমাজের সঙ্গে তাঁর এই সংযোগ-বৃত্তের কিছু সাক্ষ্য, কিছু প্রমাণ, সেকালের খবরের কাগজেও ছড়িয়ে আছে। যেমন, ২৪ মার্চ ১৮৫৫ তারিখের দৈনিক 'সিটিজেন'-এর পাতায় একটি উত্তেজক বিবরণ পেয়ে যাচ্ছি। পত্র-লেখক জানাচ্ছেন : বিধবাবিবাহ বিষয়ে প্রথম বইটির খানকয়েক কপি এক তরুণ যেই তার গ্রামে নিয়ে যায়, তক্ষুনি, ছোটো-বড়ো নানান বয়সের একদল মেয়ে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধ'রে ব্যাকুল অনুরোধ করে, পড়ে শোনাও বিদ্যাসাগরের বই ! কত মন দিয়ে তারা সেই পাঠ শোনে, আর কী জ্বলন্ত উৎসাহে তাদের মতামত জানায়—একেবারে অনর্গল, অকুণ্ঠিত, তাত্ক্ষণিক—তারও একটি উপাদেয় ছবি ঐ পত্রলেখক দিচ্ছেন। ২৫

নারীসমাজের জন্যে তাঁর যা কিছু উদ্যোগ, তা সরাসরি কৌমের এক্তিয়ারে বর্তায় তো বটেই। ভাষাচার্য ক্ষেত্রে তাঁর যে-কাজ, সেটাও পড়ে সমাজের ওই শ্বিতীয় এলাকায়, কৌমের এলাকায়। কারণ, ভাষা তো কৌমেরই অঙ্গ ; তার রক্তস্রোত। বর্ণপরিচয় লিখে, ভাষার অন্তঃশীল ছন্দঃস্রোত খুঁজে বার করে—গদ্যকে ছিরিছাঁদ দিয়ে—তিনি বাঙালির এই কৌমসত্তারই প্রকাশক্ষমতা আর সংবিৎ বাড়িয়ে গেছেন।

পাঁচ

এই যে-বাক্যস্পন্দ তাঁর গদ্যকে প্রাণিত করল, অবয়ব দিল, সেটা কি ঔর ব্যক্তিগত শ্বাসক্ষেপের প্যাটার্ন ? না, সেটা বাঙলা ভাষার মূল গঠনতন্ত্রেরই অঙ্গ ?

সমস্যাটা বড়োতে সুবিধে হয়, আধুনিক ভাষাতত্ত্বে সোসদ্যর 'লাঙ্গ' আর 'পারোল'-এর যে-ভাগ করেন, সেখান থেকে যদি এগোই। 'লাঙ্গ'-এর বাঙলা করা যেতে পারে : ভাষা। আর 'পারোল'-এর : বাচন। 'লাঙ্গ' বলতে বোঝায় একটি ভাষার ব্যবস্থাতন্ত্র ; যা ব্যাক্তিবিশেষ সৃষ্টি করতে পারে না। আর, 'পারোল' হল ব্যক্তি-কর্তৃক ঐ কৌমগত ভাষাতন্ত্রের ব্যবহার, বাস্তবায়ন। সোসদ্যর বলেন, ভাষা থেকে বাচনের তফাৎ করতে গিয়ে আমরা একই সঙ্গে যা-সামাজিক আর যা-ব্যক্তিগত, এই দুইয়ের, তফাৎ করছি। ২৬ প্রথমে ভলোশিনভ, ২৭ তারপরে, রোল' বাত' ২৮-এর মতন কোনো কোনো ভাবুক এই ভাষা আর বাচনের সম্পর্কে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে এ-আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। ঔরা বলেন : ভাষা আর বাচন দুটো বিচ্ছিন্ন মহল নয় ; ওদের মধ্যে নিরন্তর কাজ করছে একটি ডায়ালেকটিক। ভাষাহীন বাচন নেই ; বাচনহীন ভাষাও নেই। 'লাঙ্গ' আর 'পারোল'-এর এই-যে ঐক্য, বিনিময় ; এই-যে মূহূর্তের মূহূর্তের মিলনবিন্দু—এইটেই মানুষের ভাষার সঞ্চারক্ষেত্র।

গদ্যের ছন্দকেও হয়তো এইভাবে দেখতে পারি। বিদ্যাসাগরের গদ্যে যে-ছন্দঃস্পন্দ

শুনতে পাই, তা হল ওই ‘লাগ’ আর ‘পারোল’-এর সংযোগ-তরঙ্গ : একাধারে, বাঙালি কৌমের বাক্-স্পন্দ আর বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত শ্বাসক্ষেপের সারি সারি ছেদবিন্দুর সমবায়ে এক স্পন্দমান সঞ্চারগরেখা। সামাজিক ফ্রন্টে দিন-রাতের অবিরাম সংঘর্ষের মারফৎ কৌম আর ব্যক্তিস্বরূপের যে-ডায়ালেকটিক মূহুর্তে মূহুর্তে সৃষ্টি করে চলছিলেন বিদ্যাসাগর, তাঁর গদ্যের স্পন্দনেও তারই সমান্তরাল একটি গ্রাফ জেগে ওঠে।

ওপরে যা বললুম, তা স্পষ্ট করবার জন্যে পর পর দুটো উদাহরণ দেব। দুটোতেই বাঙলা গদ্যের স্বাভাবিক স্পন্দ, চাল, নিভুল ধরা পড়েছে। প্রথমটি তো খুবই সরল ; মাত্র দুই বাক্যের একটি ছোটো অনুচ্ছেদ ধরে রাখছে এই তীর একোক্তিকে :

‘হা ধর্ম ! তোমার মর্ম বুঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান।’^{২৯}

বিদ্যাসাগর এখানে তুলে আনছেন অবিকল মদুখের ভাষার ছাঁদ ! নিশ্বাসের লয়ে-তালে শব্দ-উচ্চারণের এই ওঠানামার বিন্যাসে এখানে পাঁচি কৌমগত আর ব্যক্তিগতের সচল সংগতি। যতিচিহ্ন শূন্য, স্বরলিপি মতো, ওঁর অভিপ্রেত শ্বাসক্ষেপ, গতি আর বিরামের সন্ধেতদুলি দেখিয়ে দিচ্ছে—এই মাত্র। আর, অবশ্যই, ভাষার এই বাঁধনিত স্পন্দিত হচ্ছে ওঁর ব্যক্তিগত আবেগ, বিবেকবোধ।

দ্বিতীয় উদাহরণ :

‘কিছুকাল পূর্বে’, এই পরম পবিত্র গোড়দেশে, কৃষ্ণহারি শিরোমণি নামে, এক সুপরিচিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যযুগকা বিধবা নারী, প্রত্যহ, তাঁহার কথা শুনিতেন। কথায় শুনিয়া, এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি, অবাধে, সন্ধ্যার পর, তাঁহার বাসায় গিয়া, তদীয় পরিচর্যা নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া, অবশেষে, ঐ বিধবা রমণী গুণমণি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

‘এক দিন, শিরোমণি মহাশয়, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রীজাতির ব্যাভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্তন করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছিলেন, “যে নারী পর পুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া, তাহাকে, অনন্ত কাল, যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলি বৃক্ষ আছে। তাহার শব্দ দেশ অতি তীক্ষ্ণগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদত্তেরা, ব্যাভিচারীকে, সেই ভয়ঙ্কর শাল্মলি বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া, বলে, তুমি, জীবদ্দশায়, প্রাণাধিকারিণ উপপাতিকে, নিরতিশয় প্রেমভরে, যেদ্রুপ গাঢ় আলিঙ্গনদান করিতে ; এক্ষণে, এই শাল্মলি বৃক্ষকে, উপপাতি ভাবিয়া, সেইদ্রুপ গাঢ় আলিঙ্গনদান কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে, যমদত্তেরা, যথার্থিহত প্রহার ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া, বলপূর্ব্বক, তাহাকে আলিঙ্গন করায়। তাহার সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায় ; অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে ; সে, যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া, অতিকরুণ স্বরে, বিলাপ, পরিতাপ, ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই

সমস্ত অনুধাবন করিয়া, কোনও স্ত্রীলোকেরই, অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক সুখের অভিলাষে, পর পদ্রুবে উপগতা হওয়া উচিত নহে” ইত্যাদি।

‘ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগবৃত্তান্ত শ্রবণে, কথকচুড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, “যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই; অতঃপর, আর আমি, প্রাণান্তেও, পর পদ্রুবে উপগতা হইব না”। সে দিন, সন্ধ্যার পর, তিনি, পদ্ব্যবহা, শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাব্যবহা আর আর পরিচর্যা করিলেন; কিন্তু অন্যান্য দিবসের মত, তাহার চরণসেবার জন্য, যথাসময়ে, তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

‘শিরোমণি মহাশয়, কিয়ৎ ক্ষণ, অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে, অধৈর্য হইয়া, তাহার নামগ্রহণ পদ্ব্যবহা, ব্যাবহা আর আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং, গলবস্ত্র ও কৃতাজলি হইয়া, গলদণ্ড লোচনে, শোকাবলি বচনে কহিলেন, “প্রভো! কৃপা করিয়া, আমার ক্ষমা করুন। সিমল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া, আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি; আপনকার চরণসেবা করিতে, আর আমার, কোনও মতে, প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি”।

‘সেবাদাসীর কথা শুনিয়া, পণ্ডিতচুড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাতোত্থান করিলেন; এবং দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্তে ধরিয়া, সহাস্য মুখে কহিলেন, “আরে পাগলি! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যা হইতেছ না? আমরা, পদ্ব্যবহা, যেরূপ বলিয়া আসিতোছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। সিমল গাছ, পদ্ব্যবহা, ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, যথার্থ বটে; কিন্তু, শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লৌহময় কণ্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে, সিমল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে; এখন আলিঙ্গন করিলে, সর্ব শরীর শীতল ও প্লবীকৃত হয়”। এই বলিয়া, অভয়প্রদান ও প্রলোভনপ্রদর্শন পদ্ব্যবহা, শয্যা হইয়া গিয়া, গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে, পদ্ব্যবহা, চরণসেবা প্রবৃত্তি করিলেন।” ৩০

দ্বিতীয় উদাহরণটিতেও ওই কৌমগত আর ব্যক্তিগত বাক্-স্পন্দের টানাপোড়েন ফুটে উঠছে; তবে আরও জটিল নকশায়। কারণ, বিদ্যাসাগর এখানে ওঁর উক্তি কে এমন অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদে গড়ছেন যাদের বদননি জটিলতর। ভলোশিনভ বলেন, অনুচ্ছেদ হল প্রতিহত সংলাপ। ৩১ এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বিদ্যাসাগর তাঁর একোক্তির স্রোতে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন আরও অনেকের উক্তি, তাদের বাক্-ভঙ্গি সমেত। ফলে, আমরা এখানে, এই অনুচ্ছেদমালায় পেয়ে যাচ্ছি: প্রায়-অপ্রতিহত, বহুস্বর সংলাপ। কথকঠাকুর আর সেবাদাসীর ঐ দুই পৃথক বাক্-ভঙ্গি, স্বর, বিভিন্ন স্পন্দের এক মিশ্র প্যাটার্ন তৈরি করছে। কথকঠাকুরের বলার ধরণ যখন বিদ্যাসাগর নকল করছেন, তখন আনছেন, চাপা স্নেহের ধাঁচ (‘সিমল গাছ তেল হইয়া গেছে’)। সেবাদাসীর সংলাপে ফোটাচ্ছেন মেল্লি ছাঁদ, স্বর। আর লেখকের আইরিশ-মেশানো স্বরভঙ্গি (‘এই পরম পবিত্র গোড়দেশে’) এই প্যাটার্নকে বিচিন্নতর করে তুলছে।

ছয়

‘বিদ্যাসাগরী ভাষা’ নামক সংস্কৃত-সমাকীর্ণ এক অনড় রীতিবিশেষের ধারণাটা এই মূহুর্তে ফেলে দেওয়া দরকার। আসলে তো কাকে বলছেন আর কী বলছেন, সেই নিরীক অনুযায়ী তাঁর রীতি বদলায় ক্রমাগত। বাস্তবিক, পাঠকের প্রতিক্রিয়া আর সক্রিয় বোধকে এতটা দাম সেধুগে আর ক’জন গদ্যালিখিয়ে দিয়েছিলেন? তাই সংস্করণে সংস্করণে পালটে যায় তাঁর পদবিন্যাস আর যতিচিহ্ন। বিদ্যাসাগরের সব লেখায়—এমনকি ‘বর্ণপরিচয়’-এও—পাঠক সগোরবে উপস্থিত। উপস্থিত বলেই ‘সীতার বনবাস’ আর ‘বিদ্যাসাগর চরিত’-এর ছাঁদ আলাদা। ‘প্রভাবতীসম্ভাষণ’-এর চাল, স্বরভাঙ্গ, তো আরও অন্যরকম। একই কারণে একটা বই থেকে অন্য বইয়ে তৎসম তন্তব দেশী বিদেশী শব্দের অনুপাত বদলে বদলে যায়। ‘বেতালপর্ষ্যবংশীতি’ বা ‘সীতার বনবাস’-এ যত তৎসম শব্দ ভিড় করে আসে, ‘আবার অতি অল্প হইল’-তে ততটা নয়। ‘আবার অতি অল্প হইল’-তে আরবি-ফারসি শব্দ দেবার পেয়ে যাচ্ছ; অথচ ‘সীতার বনবাস’-এ তার প্রয়োগ দুল্লভ।

আরবি-ফারসির প্রসঙ্গ যখন উঠে পড়ল, তখন বলি : ভবানীচরণের ‘কলিকাতা কমলালয়’ (১৮২৩) বইয়ে এ-ধরনের শব্দকে শুদ্ধ লেখারই নয়, কথা-বলার ভাষাতেও অচ্ছূত গণ্য করা হয়েছে। ভাবার ভাঁড়ারের কিছু শব্দ যেন গগ্গাজল দিয়ে ধোয়া আর বাদ বাকি অপবিত্র! এই শূচিবায়ুর পেছনে হয়তো-বা সাম্প্রদায়িক মেজাজের কিছু জেরও ছিল; কারণ আরবি-ফারসি শব্দকে ‘কলিকাতা কমলালয়’ বলছে : ‘যাবনিক’ আর তৎসমকে : ‘স্বজাতীয়’।^{৩২} এই সাম্প্রদায়িক শূচিবায়ু বিদ্যাসাগরকে পেয়ে বসে নি। কলিকাতার ভদ্রলোকের ভাষায় ব্যবহৃত কম, কলম, কসম, কবুল—এইরকম ১৮২টি ‘যাবনিক’ শব্দের একটি ফর্দ ভবানীচরণ করেছিলেন।^{৩৩} বিদ্যাসাগর তাঁর ‘খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ’-এর তালিকায় এই ১৮২টির মধ্যে ১৪৩টি শব্দই নিয়েছেন, বেকসুর!^{৩৪}

বিদ্যাসাগরের ওই ‘শব্দ-সংগ্রহ’ ভাষা সম্পর্কে গুরু ধ্যানধারণা বৃদ্ধিতে আমাদের সাহায্য করে। সাহিত্য পরিষদের পত্রিকায় এই ‘শব্দ-সংগ্রহ’ ছাপার সময়ে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর দিবেদী লেখেন : ‘বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ একটা অনুযোগ প্রচলিত আছে। তৎ-সংস্কৃত তালিকা হইতে প্রতিপন্ন হইবে, খাঁটি বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার অগ্রদ্বা ছিল না। বরঞ্চ বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য সহকারে তিনি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সংকলনের পরিশ্রম স্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শূন্য যায়, একখানি বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।’^{৩৫}

খুব সম্ভব তা-ই। নয়তো এত যত্ন আর ধৈর্য নিয়ে মোট সাত হাজার আর্শিট (৭০৮০) চলতি বাঙলা শব্দ খুঁজে, বেছে, জড়ো ক’রে, তারপর আবার সেগলোকে বর্ণানুক্রমে সাজাতে যাবেন কেন বিদ্যাসাগর? কী সংকলনের রীতি, কী বানান পদ্ধতি খুঁটিয়ে লক্ষ করলে বোঝা যায়, পিঁপড়ি বাই তাঁর কিছুমাত্র ছিল না। বাঙলায় তো অন্তঃস্থ

ব নেই ; তাই এ তালিকার বর্ণবিন্যাসে ব একটি ; সব বকারাদি শব্দ বর্গীয় ব-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তিনি। এমন কোনও শব্দ তাঁর তালিকায় জায়গা পায় নি যার আদ্যক্ষর : ঈ উ ঋ ঋ ষ। কেন ? সম্ভবতঃ ওঁর বিবেচনায় ঐ সব বর্ণ চলতি বাঙলায় উচ্চারণ নয়। অতঃসম শব্দের বানানে তিনি যে সংস্কৃতবোধি মোটেও মানতেন না, নীচের বানানগুলো লক্ষ করলে তা বোঝা যাবে :

উজ্জাপন উজ্জাগ কুমির জাঁতা তাঁতিনি দাঁবি দিঘি ধোপানি ননদিনি ননি নৌকি
পাখি বাঘানি বাঙালি বড়ি মানিক রাখি সেকরানি।

‘পদবি’ বানান করেছেন তিনি ‘ই’ দিয়ে ; অথচ ‘চলন্তিকা’তেও (পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৫৩) আছে ‘পদবী’। হ্রস্ব ‘ই’ দিয়ে ‘পদবি’ বানান শুদ্ধ বটে ; তবে এমন নয় যে তৎসম শব্দের বানানে তিনি সর্বদা সংস্কৃত নিয়ম মেনে চলতেন। এই তৎসম শব্দের বানান নিয়ে তাঁর পণ্ডিতিয়ানা-মুগ্ধ স্বেচ্ছদৃষ্টির একটি গল্প বলি : একবার আঁবনাশচন্দ্র মদুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরকে বলেন, “‘যাবদীয়’ বানানটাই ব্যাকরণসংগত, তবে আপনি ‘যাবতীয়’ লেখেন কেন ?’ বিদ্যাসাগর জবাব দেন, “‘যাবদীয়’ কথাটাই ঠিক জানি ; কিন্তু ‘যাবতীয়’ কথাটা বাঙলা ভাষায় অনেক দিন চলে আসছে ; আমি ও বদলাতে পারব না।”^{৩৬}

সাত

এতক্ষণ যেভাবে যুক্তিবিস্তার করেছি, তার প্রতিপাদ্য এই : বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষ কৃষক-আন্দোলন না-করলেও চাষী-সাঁওতাল বিষয়ে মূল্যবোধ তাঁর চারিত্রলক্ষণ ছিল। ভাষাচার্য আর নারীসমাজের জন্যে তাঁর কর্মকাণ্ডকে যদি এই মূল্যবোধের সঙ্গে একত্রে মিলিয়ে দেখি, তাহলে টের পাই, তাঁর সবচেয়ে তাৎপর্যময় কাজের জায়গা হচ্ছে : বেসরকারি সমাজ।

বাস্তবিক, উপনিবেশের শাসনে-শোষণে নিঃস্পষ্ট ভারতবর্ষে সমাজের ওই দ্বিতীয় এলাকার বিবর্ধনে, সংগঠনে রবীন্দ্রনাথ* বা গান্ধির মতন বিদ্যাসাগরেরও ভূমিকাবিচার আমাদের একটা বড়ো কাজ।

বড়ো কেন ? উনিশ শতক থেকে শুরুর করে আজ অবধি বাঙালি মধ্যবিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এক সম্মোহ, যাকে আমি বলব : রাষ্ট্রেরতি। সাম্রাজ্যের আওতায় যে-রাষ্ট্রযন্ত্রণাজিয়ে ওঠে তার সুখদা-বরদা শক্তির বিষয়ে এই সম্মোহ লালন করেছিল আমাদের গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ মোহে স্বয়ং বিদ্যাসাগর আবিষ্ট ছিলেন ; অথচ সেকালে তাঁর মতন

* এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগসূত্র অনেকটা প্রত্যক্ষ। দীনেশচন্দ্র সেনকে একটি চিঠিতে (নভেম্বর ১৯০৫) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : ‘নূতন পর্যায বঙ্গদর্শনে এই আত্মশক্তি-চর্চা ও স্বদেশী ভাবের দিকে দেশের চিন্তা আকর্ষণের জন্য উপদেশের প্রবর্তন করা হয় এবং বোলপুরের বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষার ভার নিজের হাতে ও স্বদেশী ভাবে প্রবর্তনের চেষ্টা। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় অগ্রণী।’^{৩৭}

স্বাবলম্বন-চর্চা আর কেউ করে নি—এখানে তাঁর স্ববিরোধ এবং গদ্বুদ্ধ। মশনদে এখন আর ইংরেজ নেই। কিন্তু দুর্মর সে রাষ্ট্ররতি ইদানীং বেড়েছে বৈ কমে নি। সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে—বাড়ছে—রাষ্ট্রের এক্তিয়ার। সরকারি সমাজের দাপট যত বাড়ছে, তত গদ্বুদ্ধ নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে তার প্রতিস্পর্ধী এলাকা : বেসরকারি সমাজ। তাই এদেশের এই বেসরকারি সমাজের আলোচনা এবং তার শক্তি-বাড়ানোর বিদ্যাসাগরের ভূমিকাবিচার আজ এতটাই বড়ো কাজ হয়ে উঠল। কাজটা শুদ্ধ বড়ো নয়, খুবই জরুরি ; আমাদের গোটা সমাজ-কাঠামোর স্বন্দ, জটিলতা, জোর বোঝার জন্যেই এই কৌমকে চেনা আর জানা দরকার। সমাজের এই মফস্বল এদেশের সমস্ত ইতিহাসের উৎসভূমি।

যার মৃত্যু ঘটে, দুর্ভোগটা তো তার নয় ; দুর্ভোগ পোয়াতে হয় তাকে, যে বেঁচে-বর্তে রইল। বিদ্যাসাগর তো মরে বেঁচেছেন। আপাততঃ আমরা বেঁচে মরে থাকব, না, তরে যাব, তা অনেকটা নির্ভর করছে আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের ওপর। বিদ্যাসাগরের পুনর্বিচারে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী কতটা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছেন সেটা ওঁদের আত্মসচেতনতারও নিরিখ। মনে পড়ছে, বিদ্যাসাগরের চারিত্রকে প্রদ্বাৰ্ঘ্য জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কাণ্ডজ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল।' ৩৮

আট

বামুন, নৈয়ামিকের কথা আলাদা ; সাধারণের সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানের একটা নিকট সম্পর্ক আছে। যারা আর দশজনের সঙ্গে নিজেদের কৌলীন্য উৎকট আতিশয্যে জাহির করতে উদ্গ্রীব, তাদের মধ্যেই কাণ্ডজ্ঞানের অসাধারণ খামতি লক্ষ্য করি। অন্য পক্ষে, গায়ে-গতরে খেটে যাদের পেটের ভাত আর পরনের কাপড় জোগাড় করতে হয়, কাণ্ডজ্ঞান ছাড়লে তাদের তো চলবেই না। স্বভাবতঃই প্রবাদে-প্রবচনে যে-কৌমনের পরিচয় পাই, তাতে কৃষকশোভন এই টনটনে কাণ্ডজ্ঞানের ছাপ খুবই স্পষ্ট। এই কাণ্ডজ্ঞানের সূত্র দিয়ে কৌমের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক আরেক দিক থেকে বুঝে নিতে পারি।

বিদ্যাসাগর-চারিত্রের অনন্যতন্ত্রতার ওপর রবীন্দ্রনাথ ঝোঁক দিয়েছেন। ৩৯ এক হিশেবে কথাটা তো ঠিকই। আসলে, তাঁর চারিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়তো এই যে একদিকে তিনি অনন্যতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, অন্যদিকে সাধারণের সঙ্গে তাঁর সহজ ঐকাত্ম্য ছিল। গোটা কৌমকে নিয়ে তিনি চলার চেষ্টা করেছেন অথচ কৌমের সমালোচনাও করেছেন। তাঁর জীবনচরিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজের সাধারণের ক্রমান্বয় সম্পর্ক-তৈরির ইতিবৃত্ত। সে ইতিহাসে ভাঙাগড়াও আছে, চাপও আছে ; কিন্তু অল্প-তৈরির সেই চেষ্টা দুর্মর। যে-সাধারণ্যকে 'কৌম' বলছি, তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি বড়ো যোগসূত্র ছিল তাঁর ওই প্রথম কাণ্ডজ্ঞান।

এই কাণ্ডজ্ঞান হয়তো বিদ্যাসাগরের স্বভাবগত ছিল ; কিন্তু যা লক্ষণীয় তা হল : তিনি

মননগত স্তরেও তার অনুশীলন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে স্কটল্যান্ডে কাণ্ডজ্ঞানের ভিত্তিতে একটি দার্শনিক আন্দোলন গড়ে ওঠে যার নামই ‘কমনসেন্স ফিলসফি’। সাহিত্য পরিষদে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব সংগ্রহে দেখেছি, এই দর্শনের মূল বইগুলির প্রায় সব কপিইই সেখানে রয়েছে। বিশেষতঃ কাণ্ডজ্ঞানের দর্শনের মূল প্রবক্তা টমাস রীড-এর (১৭১০-১৭৯৬) আর সে দর্শনের প্রভাবশালী ভাষ্যকার ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট-এর (১৭৬৩-১৮২৮) সমগ্র রচনাবলি বিদ্যাসাগর সংগ্রহ করেছিলেন।^{৪০} ডুগাল্ড স্টুয়ার্টের যশ এতই ব্যাপ্ত ছিল যে শুধুই স্কটল্যান্ড আর ইংল্যান্ড থেকেই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, উত্তর জার্মানি আর ইওরোপের নানান অঞ্চল থেকেও তরুণ ছাত্ররা তাঁর দর্শনের ক্লাসে ভিড় করে আসত। রীড আর স্টুয়ার্ট-এর প্রভাব পশ্চিম জগৎ পেরিয়ে কলকাতার তরুণ মনেও ছড়িয়ে পড়ে। ডিরোজিও স্বয়ং ১৮৩১ সালের ২৬ এপ্রিল তারিখে হোরেস হেম্যান উইলসনকে লেখা একটি চিঠিতে বলছেন, তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে রীড-স্টুয়ার্ট-এর দর্শন নিয়ে চর্চা করতেন।^{৪১} বিদ্যাসাগর যে ডুগাল্ড স্টুয়ার্টের বইপত্র খুঁটিয়ে পড়েছিলেন, এই অনুমানের পক্ষে কিছু যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, স্টুয়ার্টের ‘এলিমেন্টস অফ দ্য ফিলসফি অফ দ্য হিউম্যান মাইন্ড’ বইয়ের (১৮৫৪ সংস্করণ) সাত জায়গায় আর ‘লেকচারস অন পলিটিক্যাল ইকনমি’-র (১৮৫৫ সংস্করণ) চার জায়গায় মার্জিনে পেনসিলের দাগ দেখেছি। এইভাবে পেনসিলের দাগ দিয়ে পড়া বিদ্যাসাগরের অভ্যাস ছিল।^{৪২} দ্বিতীয়তঃ, চিহ্নিত জায়গা-গুলোয় বিদ্যাসাগরের অভ্যন্তরীণ মতের সমর্থন বা অনুরণন পেয়ে যাচ্ছি। উদাহরণতঃ স্টুয়ার্টের ‘এলিমেন্টস অফ দ্য ফিলসফি অফ দ্য হিউম্যান মাইন্ড’-এর প্রথম খণ্ডের ২৩০ পৃষ্ঠায় সেই চিহ্নিত অংশের উল্লেখ করা যায় যেখানে এই স্কটিশ দার্শনিক বলছেন : ‘আইন-প্রণয়নের রীতি এখন বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। জনমতের সম্ভাব্য গতি কোন দিকে, তা এখন আন্দাজ করা অনেকটা সহজতর। একজন বিচক্ষণ আইনপ্রণেতা কোন লক্ষ্যের দিকে এগোবেন, সে বিষয়ে নিজের কাছে স্পষ্ট ও স্থির ধারণা গড়ে তোলা এখন রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে [আগেকার দিনের তুলনায়] সহজ হয়ে উঠল।’ এই সূত্রে ওই বইয়ের ৩১৬, ৩১৭ পৃষ্ঠার সেই চিহ্নিত জায়গাগুলোও মনে পড়েছে, যেখানে স্টুয়ার্ট ঘুরে ঘুরে বলছেন : নিজের নিজের ধর্মের সঙ্গে জড়ানো যে-সব রীতিনীতি আচার বা সংস্কারের মধ্যে মানুষ আবাল্য বড়ো হয়ে ওঠে সেগুলো বন্ধমূল হয়ে যায় তার মজ্জার মজ্জায়।

‘কমন সেন্স’-এর আক্ষরিক তর্জমা করা যেতে পারে : সাধারণ বুদ্ধি। লোকায়ত সাধারণ বুদ্ধির কাছে এই দার্শনিক আন্দোলনের আবেদন। দর্শনের কুটকচাল নিয়ে যাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই, সেই প্রাকৃত জনের ধ্যানজ্ঞানকে পরিগ্রহণ করে তাকে উত্তরণ করতে চেয়েছেন এই দার্শনিকেরা। ওঁদের লক্ষ্য ছিল : দর্শনচর্চার সঙ্গে ওঁদের মননজীবনের সাধারণ মানবিক উপাদানের সংগতি সাধন।

টমাস রীড তাঁর দার্শনিক অনুসন্ধানকে স্থাপন করেছিলেন বেকন-এর ‘নোব্দম

ওরগানুম' (*Novum Organum*)-এর পদ্ধতির ওপর। ওঁর বিবেচনায় নিউটন-এর পদার্থবিদ্যাও ওই একই পদ্ধতির দৃষ্টান্ত। রীড বলছেন, 'বেকনের দর্শনবিধি' (*Regulae Philosophandi*) আসলে সাধারণ বুদ্ধিরই নীতিসূত্র। সাধারণ জীবনের দৈনন্দিনে ঐ নীতিগুলির প্রয়োগ হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। যিনি অন্য নিয়ম মেনে কী বস্তুবিশ্ব নিয়ে, কী মন নিয়ে দর্শন চর্চা করেন, তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট।^{১৪৩} যে-সত্য সর্বমানবের সুখের সঙ্গে জড়িত তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই ছিল রীডের অভিপ্রায়।

শুধু বার্কলে-র প্রতি বিরাগ এবং *বেকন-নিউটনের প্রতি অনুরাগই যে এই স্কটিশ দার্শনিকদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতৈক্য তৈরি করে, তা নয়। এই দর্শনের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বড়ো ঐক্য, বোধ করি, কাণ্ডজ্ঞান বা সাধারণ বুদ্ধিকে ফাস্ট প্রিন্সিপল—মূল তত্ত্ব—হিঁশেবে গ্রাহ্য করায়। বিদ্যাসাগরের এই মনোভাব তো তাঁর সমস্ত লেখায় আর কাজকর্মে জ্বলজ্বল করছে। তবে তাঁর বিচারপদ্ধতিকা 'রত্নপরীক্ষা'-র উপসংহারে একটি গল্পে এইটে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কমনসেন্স ফিলসফির সঙ্গে তাঁর মেজাজের মিল দেখানোর জন্যে সেই গল্পটি এখানে তুলছি :

'কোনও গ্রামে, এক বিদ্যাবাগীশপরিবার ছিলেন। বিদ্যাবাগীশেরা চারি সহোদর। চারি সহোদরই বিদ্যাকে নৈরাগিক। জ্যেষ্ঠের স্বগ্রামেই চতুষ্পাঠী ছিল ; মধ্যম, তৃতীয়, ও কনিষ্ঠ, কিণ্ডিং দূরবর্তী গ্রামগ্রয়ে, অধ্যাপনা করিতেন। তদীয় বাসগ্রামের সন্নিকটে, একটি ফোঁজদারী আদালত ছিল। আদালতের সেরেস্তাদার ঐ গ্রামে বাসা করিয়া থাকিতেন, এবং বিদ্যাবাগীশদের বাটারী সম্মুখে যে গ্রাম্য রাস্তা ছিল, প্রায় প্রত্যহ, ঐ রাস্তা দিয়া, আদালতে যাতায়াত করিতেন।

'এক দিন, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ, স্বেচ্ছায় দণ্ডায়মান হইয়া, ধূম্রপান করিতেছেন, সেই সময়ে সেরেস্তাদার, আদালতের উপযোগী বেশে, কক্ষস্থানে যাইতেছেন। ঈদৃশ বেশধারী পুরুষ, ইতঃপূর্বে, কখনও, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশের নয়নগোচর হয় নাই ; সুতরাং, তদর্শনে তিনি চমৎকৃত হইলেন। সেই দিন, অপরাহ্নেও, বিদ্যাবাগীশ, স্বেচ্ছায়

* বিশপ বার্কলে-র 'ব্রান্ত দর্শন' বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বিরাগের কথা জানতে পাছি ব্যালেনটাইন রিপোর্ট নিয়ে তাঁর সুপরিচিত মন্তব্য থেকে। কোপার্নিকস, গ্যালিলেও ইত্যাদি বিজ্ঞানীর সঙ্গে নিউটন-এর জীবনীও তিনি সংকলন করেছিলেন 'জীবনচরিত'-এ (১৮৪৯)। ঐ ব্যালেনটাইন রিপোর্ট এসঙ্গে তাঁর মন্তব্যে যে-দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই, তার সঙ্গে বেকনের দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য তো খুবই স্পষ্ট। বেকনের প্রতি ওঁর আগ্রহ অনুরাগের আরও নিদর্শন পাওয়া যায় সাহিত্য পরিষদে ওঁর নিজস্ব বইয়ের সংগ্রহ থেকে। বিদ্যাসাগর-সংগ্রহে বেকনের এই বইগুলি আছে :

1. *The Essays*, S. W. Singer, ed., London 1857.
2. *Bacon's Essays*, Edwin A. Abbott, ed., 2 vols., London, 1886.
3. *The Essays of Lord Bacon*, John Hunter, ed., London, 1886.
4. *Novum Organum*, Andrew Johnson, tr., London, 1859.
5. *Of the Proficiency and Advancement of Learning*, G. W. Kitchin, ed., London, 1861.

দণ্ডায়মান হইয়া, ধূত্ৰপান করিতেছেন, সেই সময়ে, সেরেস্তাদার, আদালত হইতে, বাসায় প্রতিগমন করিতেছেন।

‘এইরূপে, ক্রমাগত তিন দিন, সেরেস্তাদারকে, তাঁহার বাটীর সম্মুখ দিয়া, যাতায়াত করিতে দেখিয়া, বিদ্যাবাগীশের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, অগ্নিবস্ত্র অঙ্গে, উষ্ণীশ মস্তকে, চর্মপাদুকা চরণে, ঈদৃশবেশভূষাবিশিষ্ট ব্যক্তির, অসম্ভবনের সম্মুখ দিয়া, প্রত্যহ গতাগত, ইহার অভিসন্ধি কি। নৈয়ামিক বিদ্যাবাগীশদিগের উদর তর্কশক্তিতে পরিপূর্ণ; তর্কশক্তিবলে, বিদ্যাবাগীশ সিদ্ধান্ত করিলেন, ঈদৃশ মনোহর বেশে, প্রত্যহ গতাগত করিবার অভিসন্ধি লাম্পট। তৎপরে, এই লাম্পটের স্থল কোথায়, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, অপ্রতিহত তর্কশক্তিপ্রভাবে, অসম্ভবনই এ ব্যক্তির লাম্পটের স্থল, এই সিদ্ধান্ত করিলেন। পরিশেষে, কোন ব্যক্তি ইহার লাম্পটের লক্ষ্য, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, বিদ্যাবাগীশ এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, জ্যেষ্ঠা বধু বৃদ্ধা হইয়াছেন, তিনি ঈদৃশবেশভূষাবিশিষ্ট ব্যক্তির লাম্পটের লক্ষ্য হইতে পারেন না; মধ্যমা তথৈব চ, তিনিও লক্ষ্য নহেন; তৃতীয়া রূপলাবণ্যশালিনী বটে, কিন্তু দুর্দাট কন্যা ও একটি পুত্র প্রসব করিয়া, গলিতযৌবনা হইয়াছেন; সুতরাং, তিনিও ঈদৃশ ব্যক্তির লাম্পটের লক্ষ্য হইতে পারেন না; অবশেষে, কনিষ্ঠা পূর্ণযৌবনা ও বিলক্ষণ রূপলাবণ্যশালিনী; অতএব, তিনিই এ ব্যক্তির লাম্পটের লক্ষ্য, এই সিদ্ধান্ত করিলেন।

‘অপ্রতিহত তর্কশক্তির প্রভাবে, এই অশুভ সিদ্ধান্ত করিয়া, বিদ্যাবাগীশ স্বীয় সহোদর-দিগকে, এখানে ঘোর বিপদ উপস্থিত, তোমরা পত্র পাঠ বাটীতে আসিবে, কোনও মতে অন্যথাচরণ করিবে না, এই মর্মে পত্র লিখিলেন। তাঁহারা বাটীতে উপস্থিত হইলে, চারি জনে কর্মিট করিতে বসিলেন। জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ, আদ্যোপাত্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ও স্ফূর্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত অনুজ্ঞাদিগের গোচর করিলেন। অনুজ্ঞেরা জ্যেষ্ঠকৃত সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণকার কর্তব্য কি, বল। কনিষ্ঠ, কোপে কষ্পিত কলেবর হইয়া, রোষরক্ত নয়নে, উদ্ধত বচনে কহিলেন, এক্ষণকার কর্তব্য প্রহার। জ্যেষ্ঠেরা, তথাস্তু বলিয়া, তদীয় সিদ্ধান্তের সর্বাঙ্গীণ অনুমোদন করিলেন।

6. New Atlantis, London, 1850.

7. রামকমল ভট্টাচার্য, ‘বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ’, কলকাতা, ১৮৬১.

রামকমল - অনুদিত বেকনের প্রবন্ধ-সংকলনটি বিভাসাগর দাণ দিয়ে পড়েছিলেন। ‘বায়’, ‘ভব্যতা ও শিষ্টাচার’, ‘পর্যটন’, ‘শাস্ত্রচর্চা’, এই চারটি প্রবন্ধের শিরোনামে টিক (✓) চিহ্ন দিয়েছিলেন তিনি। আর গোটা বইয়ের পনেরটি (১৫) শব্দ আওরলাইন করেন। শুধু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়, প্রাত্যহিক জীবনযাপনের নীতিতেও বেকনের সঙ্গে তিনি কতটা একমত ছিলেন, ‘বায়’ প্রবন্ধের এইসব উক্তি থেকে তা বোঝা যাবে:

‘স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত অবসরে সর্বদা বায় করাও দৃশ্যীয় নহে কিন্তু সচরাচর সাংসারিক বায় করিবার সময় ওজন বুঝিয়া চলা উচিত।...

যদি আহারের পারিপাট্য বিষয়ে প্রভুত বায় কর, তবে পরিচ্ছদের বায় কমাতে হইবে।’ রামকমল ভট্টাচার্য, ‘বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ’, কলকাতা, ১৮৬১, পৃ. ৯-১০।

‘पर दिन, चारि सहोदर, बन्धुपरिकर हईया, सेरेस्तादारैर आगमन प्रतीक्षाय, यष्टि हस्तु म्बारदेशे दम्भयमान रहिलेन । तनि यथाकाले उपस्थित हईबामात्र, आः ! दुरात्मन्, तोमार यद्रूप आचरण, तद्रूपयुक्त फलभोग कर, এই बलिआ, क्रोधे अन्ध हईया, चारि सहोदरैह, नितान्त निन्दन रूपे, ताँहार उपर, अविश्रान्त, यष्टिप्रहार करिते लागिलेन । সেই समये, घटनाक्रम, कतकगुलि भद्र लोक ऐस्थाने उपस्थित हईलेन । ताँहारा विद्याबागीशदिगके प्रहारक्रिया हईते निवृत्त करिते ना पारिले, सेरेस्तादार, निःसन्देह, पण्डित प्राप्तु हईतेन ।

‘এইরূপে নিস্তার পাইয়া, সেরেস্তাদার, হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সৰ্বশেষ সমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি, বিদ্যাবাগীশদিগকে আদালতে হাজির করিবার নিমিত্ত, দারোগাকে পাঠাইয়া দিলেন । দারোগা বিদ্যাবাগীশদিগকে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা সেরেস্তাদারকে প্রহার করিলেন কেন । জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ কহিলেন, ঐ দুরাত্মা অসম্ভবনে লাম্পট্য করিয়াছে ; সে জন্য প্রহার করিয়াছি । হাকিম শুনিয়া, সন্দেহান হইয়া, সেরেস্তাদারকে বলিলেন, এ বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য আছে, বল । সেরেস্তাদার কহিলেন, ধৰ্ম্মবিতার, আমি ধৰ্ম্ম-প্রমাণ বলিতেছি, আমি, কামিন্ কালেও, উঁহাদের বাটীতে প্রবেশ করি নাই ; গ্রামের যে সকল লোক আদালতে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কিরূপ চরিঘের লোক, জানিতে পারিবেন । হাকিম উপস্থিত গ্রামস্থ লোকদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, তাঁহারা একবাক্য হইয়া কহিলেন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা বাহা বলিতেছেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে । আমরা সেরেস্তাদার মহাশয়কে সৰ্বশেষ জানি, উনি সেরূপ প্রকৃতির ও সেরূপ চরিঘের লোক নহেন । বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা উঁহার উপর ওরূপ দোষারোপ করিতেছেন কেন, বুদ্ধিতে পারিতেছি না । আপনি উঁহাদের এ কথা, কোনও মতে, বিশ্বাস করিবেন না ।

‘এই সকল কথা শুনিয়া, হাকিম বিদ্যাবাগীশদিগকে বলিলেন, সেরেস্তাদার আপনাদের বাটীতে লাম্পট্য করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করুন ; নতুবা, কেবল আপনাদের কথায়, আমি উঁহাকে দোষী স্থির করিতে পারিব না । তখন, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ, যে অশ্রুত তর্কপরম্পরা দ্বারা, স্বীয় কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর সহিত, সেরেস্তাদারের লাম্পট্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হাকিমের গোচর করিলেন । হাকিম শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে, জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার আর কোনও প্রমাণ আছে কি না ; যে প্রমাণ দেখাইলেন, উহা দ্বারা, আপনাদের বাটীতে, সেরেস্তাদারের লাম্পট্য সিদ্ধ হইতে পারে না । এই কথা শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ হাকিমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ইহাতেও যদি লাম্পট্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে, ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত পুস্তক জলে ফেলিয়া দেওয়া উচিত ; ঐ সকল পুস্তকের আর কোনও প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না ; আমরা চলিলাম । এই বলিয়া, চারি সহোদরে, ক্রোধভরে, কাম্পিতকলেবরে,

আদালত হইতে প্রস্থান করিলেন। হাকিম প্রভৃতি আদালতস্থ সমস্ত লোক, উচ্চৈঃ স্বরে, হাস্য করিতে লাগিলেন।^{১৪৪}

এতক্ষণ ‘সাধারণ বুদ্ধি’ আর ‘কান্ডজ্ঞান’কে একই অর্থে ব্যবহার করিছিলেন। চারুচন্দ্র গুহর অভিধানের নজির দেখিয়ে বলতে পারি : ইংরেজি ‘কমন সেন্স’-এর বাঙলা অনুবাদ হিশেবে এই দুই শব্দের চলও আছে। কিন্তু এইবার, আরও বিশ্লেষণের জন্যে, গ্রাম্শির অনুসরণে ‘সাধারণ বুদ্ধি’ আর ‘কান্ডজ্ঞান’-এর মধ্যে একটা তফাৎ করব।^{১৪৫} ‘সাধারণ বুদ্ধি’ বলতে বুঝব : ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্বে জগৎকে দেখার, বোঝার যে-মনোভাঙ্গি ‘সাধারণ’ হয়ে উঠেছে। এই মনোভাঙ্গি খুব সংবদ্ধও নয়, পুরোপুরি সচেতনও নয়। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক সামাজিক স্তরের নিজস্ব ‘সাধারণ বুদ্ধি’ এবং তার ইতিহাস থাকে। অন্য পক্ষে, ‘কান্ডজ্ঞান’ হচ্ছে ব্যাবহারিক বোধ। এইটে যুক্তিবাদী বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অনিবার্যতঃ অভিন্ন না-হতে পারে, কিন্তু গ্রাম্শির ভাষায় এ হল সাধারণ বুদ্ধির ‘সুস্থ নিউক্লিয়াস’। তাই ‘কান্ডজ্ঞান’ বোঝাতে তিনি ‘সুবুদ্ধি’ কথাটা ব্যবহার করতেন।

কান্ডজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধির এই তফাৎটা করলে বিদ্যাসাগর যে সমাজ-সংস্কারের গরজে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার একটা তাৎপর্য বোঝা যায়। এ ব্যাপারে শাস্ত্রের দোহাই পাড়া নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে এযুগেও আপত্তি উঠেছে, সেযুগেও আপত্তি ছিল। যেমন, সেকালে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তিক্ষেপ করতে গিয়ে শাস্ত্রবচন তোলা নিষ্ফল।^{১৪৬} ১৮৫০ সালে সমাজসংস্কার বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ ‘বাল্যবিবাহের দোষ’ লেখার সময়ে বিদ্যাসাগর নিজেও তো কোথাও শাস্ত্রের স্মরণস্থ হন নি। কিন্তু পরে, বিধবাবিবাহের পক্ষে আর বহুবিবাহের বিপক্ষে যখন আন্দোলনে নামলেন, তিনি তখন শাস্ত্র মন্থনও করলেন, বিচারও করলেন। কেন? এ বিষয়ে তাঁর নিজের যুক্তিটা কী, সেটা আগে দেখা যাক।

বিধবাবিবাহ বিষয়ে তিনি লিখছেন : ‘...বিধবাবিবাহ কর্তব্য কৰ্ম্ম কি না, অগ্রে ইহার মীমাংসা করা অতি আবশ্যিক। যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্য কৰ্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্য কৰ্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্র কর্তব্য কৰ্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহার কর্তব্য কৰ্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কৰ্ম্মই সর্বতোভাবে কর্তব্য কৰ্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কৰ্ম্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যিক।’^{১৪৭}

আর বহুবিবাহ প্রসঙ্গে বলছেন : ‘এ দেশে সকল ধৰ্ম্মই শাস্ত্রমূলক, শাস্ত্রে যে বিষয়ের বিধি আছে, তাহাই ধৰ্ম্মানুগত বলিয়া পরিগৃহীত; আর শাস্ত্রে বাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই ধৰ্ম্মবাহিত্বত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।’^{১৪৮}

এইসব বিবৃতি পড়লে বুদ্ধিতে পারি : সমাজের একটি বিশেষ পরিমণ্ডলীকে বোঝানো এবং সমাজসংস্কারের পক্ষে তার সম্মতি আদায় বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য। তিনি জানেন, ওঁরা শূদ্ধ শাস্ত্রের যুক্তিই মানবেন ; সেই কারণে তিনি শাস্ত্র ধরে আলোচনা করছেন। এই পরিমণ্ডলীর সঙ্গে সংলাপ-তৈরির অন্য উপায় নেই।

শাস্ত্র চারিয়ে যায় সাধারণ বুদ্ধিতে। যাকে বিদ্যাসাগর 'দেশাচার' বলতেন, তারও পেছনে যে-মনোভঙ্গি নিহিত থাকে, সেটাও সাধারণ বুদ্ধির অংশ। তাঁর লেখা খুঁটিয়ে পড়লে বুদ্ধিতে পারি : বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রবিচার, আসলে, কাণ্ডজ্ঞানের আলোয় সাধারণ বুদ্ধির বিচার। তাঁর দেশাচার-সমালোচনা, মূলতঃ, কাণ্ডজ্ঞানের মানদণ্ডে সাধারণ বুদ্ধির সমালোচনা। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন, তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা—এবং তাঁর আবিষ্কৃত শাস্ত্রবচন—ক্রমে ক্রমে সেই পরিমণ্ডলীতে ছড়িয়ে পড়বে, সাধারণ বুদ্ধির অংশ হয়ে উঠবে। এইজন্যে তিনি তারানাত্মক বাচস্পতির মতন সংস্কৃতে শাস্ত্রবিচার করেননি, করেছিলেন বাঙলায়।

নয়

যখন বলছি, রাজনৈতিক সমাজ বিদ্যাসাগরের মূল কর্মক্ষেত্র নয়, তখন, স্পষ্টতঃই 'রাজনীতি' শব্দটা সংকীর্ণ অর্থে—রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে—ব্যবহার করছি। কিন্তু রাজনীতির তো একটা ব্যাপক অর্থও আছে ; সুতরাং, বেসরকারি সমাজেরও রাজনীতি আছে। সেই অর্থে, বিদ্যাসাগরেরও রাজনীতি ছিল।

সরাসরি রাজনীতি নিয়ে বিদ্যাসাগরের লেখাপত্র এখন অবধি পাওয়া যায় নি। একবার, বিরল মূহুর্তে, রাজনীতির যা সারাৎসার সেই ক্ষমতা প্রসঙ্গে তিনি একটি ছোটো মন্তব্য করেন। ইংরেজ সরকারের সাহায্য নিয়ে বহুবিবাহের মতো সামাজিক দোষের সংশোধন কাম্য নয়—প্রতিপক্ষের এই যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি লেখেন : 'আমাদের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা বলা বালকতা প্রদর্শন মাত্র। আমাদের ক্ষমতা কোথায়।' ৪৯

ঈষৎ আক্ষেপের সূরে এই-যে কথাটা উনি বলছেন, এতে ধাঁধা লাগে। প্রথমতঃ, দেশের লোকের হাতে যদি ক্ষমতাই না-থাকবে, তাহলে তিনি এত যত্নলেন কার সঙ্গে ? রাষ্ট্রিক ক্ষমতাই কি একমাত্র ক্ষমতা ? ক্ষমতার তো বহুরূপ। তার জালও তো বহুদূর অবধি ছড়ানো। রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে পাশে ওপরে নীচে—আরও ঢের সুক্ষ্মস্তরে—ক্ষমতা কি ক্রিয়াশীল নয় ? কোমের ক্ষমতা নেই ? দ্বিতীয়তঃ, 'ক্ষমতা' বলতে যদি-বা শূদ্ধ রাষ্ট্রক্ষমতাই বুদ্ধি, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে : ঐ ক্ষমতা কি কোনও পরাধীন জাতির হাতে কোনও এক শুল্কলগ্নে দৈবাৎ এসে যায় ? এ কি অর্জন করতে হয় না ?

বিদ্যাসাগরের এই রাজনীতিবোধে নানান মাত্রাও আছে, অতিবিরোধও আছে। সে রাজনীতির একটি মাত্রা, অবশ্যই, ইংরেজ শাসন দেশের পক্ষে শুল্কজনক, এই ভরসা। ৫০

ইতিহাসের নিঃস্পৃহ বিচারে সে ভরসাকে তাঁর বোধের ভুল হিশেবে মানতেই হয়। তাঁর রাজনীতির এই দিকটি নিয়ে হালে অনেকেই বিচারবিশ্লেষণ করেছেন; আমি আর ও-প্রসঙ্গে যাব না। আমি তাঁর রাজনীতিবোধের অন্য-এক জটিল দিকের কথা তুলতে চাই। এই জটিল দিকটি যথাসম্ভব গোটাভাবে হাজির করার জন্যে পর-পর তিনটে গল্প বলব।

প্রথম গল্পটি বলে গেছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : ‘একবার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা গবর্নমেন্টের কাছে কোলও এক বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া বিলক্ষণ অপমানিত হইয়াছিল; বিদ্যাসাগর তাহাদের বিষম বিমর্ষভাব দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,— “ওহে, আজকে *political world*-এ যে বড়ই *gloom* দেখে এলুম।” এই *gloom* কথাটা তিনি এমন মৃদুভঙ্গী করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গ হাসিয়া উঠিল।’ ১

দ্বিতীয় গল্পটি লিখেছেন ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এর ঐতিহাসিক পটভূমি : কলকাতায় ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। ক্ষিতীশপ্রসাদ লিখছেন : ‘বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাগণ যোগ দেবার জন্য প্রতিনিধি পাঠিয়ে অনুরোধ করেন। তিনি তাদের সোজাসুজি প্রশ্ন করেন যে, “দেশের স্বাধীনতা পেতে গেলে শেষ পর্যন্ত যদি দরকার হয় তারা কি তলোয়ার ধরতে পারে?” তাঁর এই প্রশ্নে, যারা এসেছিলেন, বিব্রত হয়ে পড়েন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, “আমাকে বাদ দিয়েই তোমরা এই কাজে এগোও”।’ ২

এতক্ষণ যে-দুটো গল্প বললুম, তাতে ভদ্রলোকের রাজনীতি নিয়ে—বিরহ ছলে মিলন আনার কলাবিধি নিয়ে—বিদ্যাসাগরের বিরাগ শূদ্ধ ব্যঙ্গনায় নয়, খুবই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। এবার তৃতীয় গল্পে আসা যাক। এ হল বিদ্যাসাগরের একটি না-বলা গল্প। টমাস জেমস-এর সংকলন থেকে ‘কথামালা’য় তিনি ঈসপ-এর সবশুদ্ধ ৮৫টি গল্প তর্জমা করেছিলেন। কিন্তু এ গল্পটি বাদ দেন তিনি। অথচ, এইটে হয়তো ঈসপের সবচেয়ে রাজনৈতিক উপকথা : এই গল্পের প্রজ্ঞা, গুঢ়ার্থ আর তীক্ষ্ণ আইরনি রেশট-এর মেজাজের যোগ্য।

জগৎ আর জগদীশ্বর বিষয়ে বহু মৌলিক প্রশ্নে যিনি এক বাচাল শতাব্দীর নির্বাক্তম মানুষ, তাঁকে বুদ্ধব কী করে? এমন মানুষের মন যদি সত্যিই বুদ্ধিতে চাই, তাহলে, তিনি কী বলছেন, তা উৎকর্ষ হয়ে শোনা যত জরুরি, তিনি কী বলছেন না, সেইটে লক্ষ করাও, ঠিক ততটা জরুরি। এইজন্যে বিদ্যাসাগরের সেই না-বলা গল্পটি এখন শোনাচ্ছি। কেন এ গল্পটি বাদ দিলেন তিনি—এ প্রশ্ন তো উঠতেই পারে। সঙ্গে সঙ্গে এইটেও ভাবতে হয় : যা ওঁর অকথিত, তা ওঁর অকথ্যও কি না?

সেই সব ব্যাঙ যারা রাজা চায়

এক ঝাঁক ব্যাঙের মনে ভারি ক্ষোভ, হায়! ওদের রাজা নেই। ওরা তাই জিউস-এর কাছে জনকয়েক প্রতিনিধি মারফৎ আর্জি পাঠাল : রাজা চাই! এই আহম্মুক দেখে

জিউস আকাশ থেকে ওদের পুকুরে একটা কাঠের গুঁড়ি ফেলে দিলেন। যেই-না ঝপাস করে গুঁড়িটা পড়ল, সেই শব্দে, মহাভয় পেয়ে, ব্যাঙের দল ঝপঝাপ জলে ঝাঁপ দিয়ে, সোঁধিয়ে গেল পুকুরের একেবারে তলায়। আশু আশু ওই কাঠের গুঁড়িটা স্থিত হল। ওরাও তখন গুঁড়ি গুঁড়ি উঠে এল, পুকুরের তলা থেকে। তারপর ওই গুঁড়িটাকে আর কিছুমাত্র তোয়াক্কা না-ক'রে, ওরা তারই মাথায় চড়ে বসল। এমনতর রাজা পেয়ে ওরা এতই বেজার হয়ে উঠল যে আবার জিউসের কাছে গিয়ে দাবি করল, এ রাজাটা বড়োই নিরেট; রাজা বদলে দাও! জিউস তখন রাগ করে পাঠিয়ে দিলেন একটা জলের সাপ। যত ব্যাঙ ওখানে ছিল, ওই সাপটা ওদের ধরল আর বেবাক গিলে ফেলল। ৫৩ □

টাকাটিপ্লনী

১. বদরুদ্দীন উমর, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর', প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১৫। বদরুদ্দীন উমরের বিদ্যাসাগর বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধটি ছাপা হয় গোলাম মুরশিদের এই সংকলনে। 'পরিচয়'-এ (অক্টোবর ১৯৭২) আমি সে লেখাটি নিয়ে আলোচনা করি। বদরুদ্দীন উমর 'পরিচয়'-এ তার যে-জবাব দেন, সেটা পরে স্থান পায় ওঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ' (ঢাকা, ১৯৭৪) নামক বইয়ে। আমার এই লেখায় ওঁর ঐ দৃষ্টি প্রবন্ধেরই উল্লেখ আছে।

২. দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, 'আমাদের নিম্নশ্রেণী ও দর্ভিক্ষ', 'নব্যভারত', চৈত্র ১২৯১, পৃ. ৫৪৭।

৩. শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, 'বিদ্যাসাগর-প্রবন্ধ', কলকাতা, ১৩০৫, পৃ. ৯২-৯৩।

৪. সাঁওতালদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আত্মীয়তার একটি দলিল-ছবি পাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই লেখায়, প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি হিশেবে যার দাম অসামান্য। শাস্ত্রী মশাইয়ের এই অভিজ্ঞতা ঘটে কমাটিাড়ি, ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে:

'রোদ্দ উঠিতে-না-উঠিতেই একটা সাঁওতাল গোটা পাঁচ-ছয় ভুট্টা লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল—ও বিদ্যাসাগর, আমার পাঁচ গন্ডা পয়সা নইলে আজ ছেলেটার চিকিৎসা হইবে না; তুই আমার এই ভুট্টাকটা নিয়া আমার পাঁচ গন্ডা পয়সা দে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ আনা পয়সা দিয়া সেই ভুট্টাকটা লইলেন ও নিজের হাতে তাকে তুলিয়া রাখিলেন। তারপর আর একজন সাঁওতাল,—তার বাজরায় অনেক ভুট্টা; সে বলিল—আমার আট গন্ডা পয়সার দরকার। বিদ্যাসাগর মহাশয় আটগন্ডা পয়সা দিয়াই তাহার বাজরাটি কিনিয়া লইলেন। আমি বলিলাম—বাঃ, এ ত বড় আশ্চর্য! খরিদ্দার দর করে না, দর করে যে বেচে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিলেন, তারপর দেখি—যে যত ভুট্টা আনিতেছে, আর যে যত দাম চাহিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই

দামে সেই ভুট্টাগুলি কিনিতেছেন আর তাকে রাখিতেছেন। আটটার মধ্যে চারিদিকের তাক ভরিয়া গেল, অথচ ভুট্টা কেনার কামাই নাই। ‘আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এত ভুট্টা লইয়া আপনি কি করিবেন? তিনি বলিলেন—দেখিবি রে দেখিবি।’

‘ভুট্টা কেনা চলিতে লাগিল। একটু অন্য কাজে গিয়াছি, আসিয়া দেখি—বিদ্যাসাগর নাই। সব ঘর খুঁজিলাম—নাই, রান্নাঘরে নাই, বাগান সব খুঁজিলাম নাই, শেষ বাগানের পিছন দিকে একটা আগড় আছে—সেটা খোলা; মনে করিলাম, এইখান দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন; সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একটা আল্পথে বিদ্যাসাগর মহাশয় হন্ হন্ করিয়া আসিতেছেন, দরু দরু করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে একটা পাথরের বাট। আমাকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই এখানে কেন? আমি বলিলাম—আপনাকে খুঁজিতেছি, কোথায় গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—ওরে খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনী আসিয়াছিল; সে বলিল—বিদ্যাসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস্। তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই বাট ক’রে নিয়ে গিছলাম। আশ্চর্য্য দেখিলাম—এক ডোজ ওষুধে তার রক্ত-পড়া বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা ত মেলা ওষুধ খায় না, এদের অল্প ওষুধেই উপকার হয়, কলিকাতার লোকের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, মেলা ওষুধ না দিলে তাদের উপকার হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কতদূর গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—ওই-যে গাঁটা দেখা যাচ্ছে, মাইল-দেড়েক হবে। আমি পূর্বেই হইতেই জানিতাম বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব হাঁটতে পারিতেন। বাংলার আসিয়া চাহিয়া দেখি, বাংলার সম্মুখের উঠান সাঁওতালে ভরিয়া গিয়াছে—পুরুষ মেয়ে ছেলে বড়ো—সব রকমের সাঁওতালই আছে। তারা দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে, কোনো দলে পাঁচ জন, কোনো দলে আট জন, কোনো দলে দশ জন। প্রত্যেক দলের মাঝখানে কতকগুলো শুক্না পাতা ও কাঠ। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াই তাহারা বলিয়া উঠিল—ও বিদ্যাসাগর, আমাদের খাবার দে। বিদ্যাসাগর ভুট্টা পরিবেশন করিতে বসিলেন। তাহারা সেই শুক্না কাঠ ও পাতায় আগুন দেয়, তাহাতে ভুট্টা সেকৈ, আর খায়;—ভারী ফুন্টি। আবার চাহিয়া লয়—কেহ দুটা, কেহ তিনটা, কেহ চারটা ভুট্টা খাইয়া ফেলিল। তাকের রাশীকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তাহারা উঠিয়া বলিল—খুব খাইয়েছিচ্ বিদ্যাসাগর। ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন; আমিও আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম; ভাবিলাম এ রকম বোধহয় আর দেখিতে পাইব না।’ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা ‘ভূমিকা’, রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ’, কলকাতা, ১৩০৮ [১৯৩১], পৃ. ৯-১২।

সাঁওতালদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আত্মীয়তার আরেকটি বিবরণ :

‘তাঁহার স্বর্গারোহনের কিছু দিন পূর্বে যখন তাঁহার শেষ পীড়ার প্রথম সূচনা হয়।

একদিন তিনি একাকী বসিয়া আছেন, বেলা স্নিগ্ধের সময়, আমি গিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ আপনি কেমন আছেন। তিনি বলিলেন, ভাল নয়। ক্রমেই অসুখ বাড়িতেছে। তাহার উপর এখানে পরিশ্রমের ঘৃণা নাই, কাজেই সুস্থ হইবার উপায় নাই। আমি বলিলাম আপনি কশ্মটাড়ে যাইলে থাকেন ভাল, আর সেখানে যাইলে অনেকটা বিশ্রামও হয়। কিছুদিনের জন্য তাহাই করুন না? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন আমার পক্ষে আজকাল সবই সমান। সেখানেও বড় ভাল থাকি না। এই কথা বলিয়া ক্ষণিক চুপ করিয়া পরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, বাপু সেখানে যাইলে থাকি ভাল বটে, কিন্তু আমার যদি অতুল ঐশ্বর্য থাকিত তাহা হইলে সেখানে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতাম, মনও ঠান্ডা থাকিত, শরীরও সুস্থ হইত। আমার সে অদৃষ্ট কৈ? আমার সে ক্ষমতা কৈ? আমি সেখানে গিয়া দিব্য অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিব, আর আমার চারি পার্শ্বে অসংখ্য নরনারী বালক বালিকা অনাহারে মারা যাইতেছে দেখিব। এটা কি প্রাণে সম্ভব? এই বলিয়া তিনি তথাকার লোকের দারিদ্র্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কিরূপে যে ব্যক্তি একসের চাউলের অন্ন, আধসের অন্নহরের ডাল আধসের আলু ও একসের মাংস অনায়াসে ভক্ষণ করিতে পারে সেই ব্যক্তি প্রতিনিয়ত পোয়াটাক ভুট্টার ছাতু খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া দিন দিন ক্ষীণ হইয়া স্বভাবের অনিবার্য নিয়মে অল্পদিন মধ্যেই কালের করাল কবলে নিপতিত হয়। যখন তিনি এই সকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন তাহার দুই নেত্র হইতে অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। ক্রমে স্বর বিকৃত হইয়া কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, 'বিদ্যাসাগর-প্রবন্ধ', পৃ. ৯০-৯২।

৫. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর', কলকাতা, ১৩৭৬, পৃ. ৪৪৮।

৬. বিপিনবিহারী গদ্যপু, 'পুৱাতন প্রসঙ্গ', অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১১৭।

৭. 'ব্রজবিলাস', সুদীপ্তিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস - সম্পাদিত, 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', কলকাতা, ১৩৪৫, পৃ. ৫৪২। (এর পর থেকে 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী' নামে উল্লেখিত।)

৮. 'আমরা শূন্য আত্মাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কতক প্রজাসাধারণ সভা নামে (জমিদারদিগের ব্রিটিস ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ন্যায়) এক সভা শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। উক্ত সভার দ্বারা সাধারণের বিশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। ভরসা করি, এই জনরব সত্য হইবে। সা, স।' 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ', ১৫ ভাদ্র ১২৭৯, ৩০-৮-১৮৭২, পৃ. ৩২৯। 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত এই খবরের উল্লেখ প্রথম পাই স্বপন বসু এই বইয়ে : 'সমকালে বিদ্যাসাগর', কলকাতা, ১৯৯৩। 'এডুকেশন গেজেট'-এর ফাইল দেখিছি উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে।

৯. 'The Shome Prokash' was first projected by Pundit Eswar Chunder Vidyasaghar, and we believe the first number was written by him.' *Hindoo Patriot*, 9 January 1865. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক-পত্র', প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৩৭৯, পৃ. ১৫৮-তে উদ্ধৃত।

সেই ইতিহাস খোদ 'সোমপ্রকাশ' যেভাবে লিখেছিল, সেটাই তুলে দিচ্ছি : 'সারদাপ্রসাদ নামক জনৈক বধির ছাত্রের ভরণ পোষণ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথমে এই পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা করেন। প্রস্তাব হয় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং এই পত্রিকাখানি লিখিবেন এবং সারদাপ্রসাদ তাহার সম্পাদক হইবেন, সারদাপ্রসাদ তৎপরে বর্দ্ধমানের মহারাজার অধীনে একটি কর্ম পাইয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোমপ্রকাশ প্রকাশের কল্পনাটিও পরিত্যক্ত হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে কেবল সংবাদ প্রভাকর ও সমাচার চন্দ্রিকা নামক দুইখানি সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছিল। তখন এই দুই খানি পত্রেরই অবস্থা অতি হীন ছিল। কোন রাজনৈতিক বিষয়ই উহাদের আলোচনার বিষয় ছিল না। ধীর ভাবে কোন সামাজিক বা ধর্ম নৈতিক প্রবন্ধ সংবাদ পত্রিকায় আলোচিত হইত না। কেবল কোন বিশিষ্ট লোকের নিন্দা বাদ, কোন সামাজিক কাণ্ডের রহস্যবাদ ইহা লইয়া পত্র দুই খানি পূর্ণ করা হইত। শ্রীরামপুর হইতে খ্রীষ্টীয় মিসনারিগণ যেসকল সাময়িক পত্রাদি প্রচার করিতেন তাহাও কেবল খ্রীষ্টীয়ভাব পরিপূর্ণ। সুতরাং একখানি উপযুক্ত সংবাদপত্রের সৃষ্টি করা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার "সোমপ্রকাশ" সৃজনের কল্পনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক দিন স্মারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আর কয়েকজন পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া "সোমপ্রকাশ" প্রকাশের প্রস্তাব করেন। সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হস্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করা হয়' (সোমপ্রকাশ, ১৫ ভাদ্র ১২৯৩, পৃ. ৬৮৮)।

১০. 'সোমপ্রকাশ'-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক কী, সেটা বুঝতে হলে স্মারকানাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পর্কটিও খোঁজা দরকার। আসলে দুজনের এই ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব, এই দীর্ঘ সহমর্মিতা 'সোমপ্রকাশ'-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে বিশেষ একটি মাত্রা দিয়েছিল। এমন নয় যে এই বন্ধুত্ব ছিল রেশমের মতন মসৃণ;—বাস্তবের কোন বন্ধুত্ব তেমন হয়? যেমন, বহুবিবাহ তুলে দেওয়ার জন্য সরকারি আইন-জারিই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় কি না, এনিয়ে 'সোমপ্রকাশ'-এর পাতায় দুই বন্ধুর তর্ক বাধে ১৮৭১ সালে। এই তর্কের বছর তিনেক পরে, ১৮৭৪ সালে, বিদ্যাভূষণ তাঁর 'বিশ্বেশ্বর বিলাপ' বইখানি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রটি আমাদের সাহিত্যে সহমর্মিতা আর বন্ধুত্বের এক দুর্লভ দলিল। সে হিশেবে এই উৎসর্গপত্রটি খুবই মনোযোগ্য। 'সোদরসমেব্দু' এই পাঠ দিয়ে শ্রদ্ধা। তারপর বয়ানটা এইরকম : 'ভ্রাতঃ / আমরা উভয়ে এক সময়ে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি। দীর্ঘকাল একত্র

অবস্থাননিবন্ধন পরস্পরের প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতার অধিকতর বৃদ্ধি হয়। সেই কারণে আমি তোমার বিষয় যেসব জানি, বোধ হয় অনেকে সেসব জানেন না।... আমার যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তুমিই সে সমুদায়ের মূল।...’ স্মরণীয় এই উৎসর্গালিপি শেষ হচ্ছে এইভাবে : ‘অভিন্ন হৃদয়স্য / শ্রীম্বারকানাথ শর্ম্মণঃ’। কথাটা লক্ষ্য করার মতন : ‘অভিন্নহৃদয়’ !

১১. বদরুদ্দীন উমর, ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ’, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১১৩.

১২. যেমন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে ‘হিন্দু পেষ্ট্রিয়ট’ জমিদারি অত্যাচার প্রসঙ্গে লেখে : ‘...the remedy lies not in breaking the permanent settlement but in fostering sentiments which make every man of wealth and station think that he exists for the good of his inferior in rank.’

১৩. Nilmani Mukherjee, *A Bengal Zamindar : Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and His Times 1808-1888*, Calcutta, 1975, p. 237. Nares Chandra Sen-Gupta, ed., *Selections from the Writings of Hurrish Chunder Mookerji*, Introduction, Calcutta, 1910, p.F.

১৪. এখানে ‘আমল’ বলতে ‘হিন্দু পেষ্ট্রিয়ট’-এ সাংবাদিক হিংশেবে হরিশের কাজকর্ম করার সময় বোঝাচ্ছি ; কর্তৃত্ব নয়। রামগোপাল সান্যাল বলেছেন, ‘হিন্দু পেষ্ট্রিয়ট’ হরিশের হাতে আসে ১৮৫৪ সালে। রামগোপাল সান্যাল, ‘হিন্দু পেষ্ট্রিয়টের ভূতপূর্ব সম্পাদক হরিশচন্দ্র মধুখোপাধ্যায়ের জীবনী’, কলকাতা, ১৮৮৭, পূর্বমুদ্রণ, ‘এক্ষণ’, পৌষ-মাঘ ১৩৭৭, পৃ. ১ দ্রষ্টব্য। আর, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন, ‘হিন্দু পেষ্ট্রিয়ট’ হরিশের কর্তৃত্বে আসে ১৮৫৬ সালে। *Selections from the Writings of Hurrish Chunder Mookerji*, p.E দ্রষ্টব্য। দুটো তারিখই ভুল। ‘হিন্দু পেষ্ট্রিয়ট’-এর মালিক ছিলেন মধুসূদন রায়। পত্রিকার স্বত্ব কার্যতঃ হরিশের হাতে আসে ১৮৫৫ সালের পয়লা জুন। তার প্রমাণ ৭ জুন ১৮৫৫ তারিখের ‘হিন্দু পেষ্ট্রিয়ট’-এ মুদ্রিত এই বিজ্ঞাপ্তি :

‘The interest and responsibility of Baboo Mudhoo Soodun Roy of Calcutta as Proprietor and Manager of the *Hindoo Patriot* Newspaper were transferred on the 1st. Instant to Baboo Harran Chunder Mookerjee of Bhowanypore. The paper will now be printed at Bhowanypore Suttia-Gyan-Suncharini Press.’

হারানচন্দ্র মধুখোপাধ্যায় ছিলেন হরিশের দাদা।

১৫. ‘হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মদুখোপাধ্যায়ের জীবনী’, ‘এক্ষণ’, পৌষ-মাঘ. ১৩৭৭, পৃ. ১৪।

১৬. যেমন, ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫ তারিখে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ লেখে : ‘The Zeminder ...as absolute proprietor of the soil, which he is in so many words declared by the Law of the Settlement to be.’

আবার, ৩ ডিসেম্বর ১৮৫৯ তারিখে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ বলে : ‘In the permanent settlement the impost was formally recognised as a tax, the soil being declared in so many words the sole property of Zemindar’.

১৭. গোলাম মুরশিদ-সম্পাদিত, ‘বিদ্যাসাগর’, পৃ. ১৪।

১৮. ‘বেসরকারি সমাজ’ এই পারিভাষিক একটু ব্যাপক। কারণ চুলচেরা বিশ্লেষণে সিভিল সোসাইটি বা পৌর সমাজও বেসরকারি সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। তবে, কৌমের তুলনায় পৌর সমাজের সঙ্গে সরকারি সমাজের ঐক্য ঢের বেশি। বিশেষতঃ আমাদের দেশে তো সরকারি সমাজের সঙ্গে পৌর সমাজের গাঁটছড়া আঁটো করে বাঁধা। আর, এদেশে ঐ দুই এলাকার মধ্যে কোনও আবশ্যিক বন্দ্বও নেই। তাই এ প্রবন্ধে ‘বেসরকারি সমাজ’ এই পরিভাষাটিকে ঈষৎ সংকীর্ণ অর্থে নিয়ে একে কৌমের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করলুম। পৌর সমাজ এবং বিদ্যাসাগর বিষয়ে আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য: Asok Sen, *Iswar Chandra Vidyasagar and his Elusive Milestones*, Calcutta, 1977.

১৯. ‘বিদ্যাসাগর চরিত—স্বরচিত’, ‘বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সাহিত্য’, পৃ. ৪৭০।

২০. ‘সাহিত্য’, বৈশাখ ১২৯৯, পৃ. ৩-১০।

২১. Lucien Goldmann, *The Hidden God*, tr. by Philip Thody, London, 1964, p. 68.

২২. ‘দ্রাশ্টিবিলাস’, ‘বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সাহিত্য’, পৃ. ৪১১। ‘দ্রাশ্টিবিলাস’-এর তৃতীয় সংস্করণে (১৮৮৪) একটি কমেডি অফ এরর দেখেছি! বইখানি লর্ড রিপনকে উৎসর্গ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। উৎসর্গপত্রে তিনি ভুল করে লেখেন : ‘This Bengali translation of Shakespeare’s *Tempest*...’!

২৩. দীনবন্ধু মিত্র, ‘নীলদর্পণ’, প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫১, পৃ. ২১।

সেকালের আরেকজন মস্ত নাট্যকার, যিনি মুখের ভাষার বোলচাল চমৎকার রপ্ত করেছিলেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ—‘বেতালপণ্ডাবংশীত’র কাছে কৃতজ্ঞতা জানান এইভাবে :

‘মাতৃভাষা জানি না বলা, ভাল নয়—মন্দ, মহাশয়ের “বেতাল” পাঠে বন্ধুঝিলাম’ (‘সীতার বনবাস’ নাটকের উৎসর্গপত্র, ১৮৮২)। দীনবন্ধু আর গিরিশ ঘোষের মতন সংলাপ-লিখিয়ে কেন এইভাবে ‘বেতাল’-এর নাম করছেন, এইটেও ভাববার কথা বৈকি।

২৪. ইন্দ্রমিত্র, ‘করুণাসাগর বিদ্যাসাগর’, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৫০৬।

২৫. স্বপন বসু, ‘সমকালে বিদ্যাসাগর’, পৃ. ৩১-৩২। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ‘সিটিজেন’-এর ফাইল খুবই জীর্ণ হয়ে এসেছে; কত দিন আর ব্যবহার্য থাকবে, সংশয়ের বিষয়। তাই ২৪ মার্চ ১৮৫৫ তারিখের ‘সিটিজেন’ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলছি। সম্পাদকের সমীপে বি. জি. কে. জেড. এই নামের আড়ালে এক ব্যক্তি চিঠিতে লিখছেন :

‘...no one has troubled himself to bring to the notice of the public the ideas entertained on the subject [Hindu Widow Remarriage] by the generality of the Hindus both males and females. ...Having received a few pamphlets on the remarriage of Hindu widows, published by Pundit Issur Bydasagur, through the kindness of a friend, I have caused them to be distributed among the inhabitants of certain villages and watched with deep interest what remarks fell from their mouths.

‘A married woman whose opinion was asked on the subject of widow remarriage by one of her relatives in the presence of her husband, observed that it is much better than those heinous crimes which widows secretly commit and thus bring disgrace and dishonour on themselves and their families.

‘Having taken a few of the pamphlets, a boy went to his own village to distribute them among his people, when a knot of women both old and young came, and stood round and begged of him to read to them some portions from one of those little books. Upon his reading one, a young widow of about 15 or 16 years of age instantly remarked that if a man can have the privilege of marrying again why is it that a woman should be deprived of the same right on the demise of her husband? At the same time another widow observed that all this while the *Shastras* were kept concealed, and are now beginning to be brought to light. Upon this an old widow, who cannot

reasonably expect to taste the sweets of conjugal felicity again, condemned the book as irreligious and heretical. In company with these some other widows thinking remarriage an impracticable affair, were heard to say that if any how the institution of *ekadosi* be abolished, it would confer an inestimable boon on their class. Such are the opinions of the Hindu female world in Bengal.

Yours truly

B. G. K. Z.'

Calcutta March 21, 1855.

২৬. F. Saussure, *Course in General Linguistics*, ed. by Charles Bally and Albert Sechehayé, tr. by Wade Baskin, New York, 1959, p. 14.

২৭. V. N. Volosinov, *Marxism and the Philosophy of Language*, tr. by Ladislav Matejka and I. R. Titunik, New York and London, 1973.

২৮. Roland Barthes, *Elements of Semiology*, tr. by Annette Lavers and Colin Smith, London, 1969, pp. 15-16.

২৯. 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব : দ্বিতীয় পুস্তক', 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ১৮৫।

৩০. 'রাজবিলাস', দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন', 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ৫৩১-৫৩২।

৩১. 'The paragraph is something like a *vitiating dialogue worked into the body of a monologic utterance*'. Volosinov, *Marxism and the Philosophy of Language*, p. 111.

৩২. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা কমলালয়', 'রসরচনাসমগ্র', কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১০।

৩৩. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা কমলালয়', পৃ. ১০-১৩।

৩৪. 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', অষ্টম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৮, পৃ. ৭৩-১৩০।

৩৫. 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', অষ্টম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৮, পৃ. ৭৩-৭৪।

৩৬. মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 'শ্রুতি-স্মৃতি', প্রথম ভাগ, কলকাতা, ১৩৩৪, পৃ. ৯২।

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র', দশম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃ. ৩৩।
৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চারিহপদ্য', কলকাতা, ১৩৬৫, পৃ. ৩৮।
৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চারিহপদ্য', পৃ. ১৫-১৬।
৪০. টমাস রীড আর ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট-এর এই বইগুলি সাহিত্য পরিষদের বিদ্যাসাগর-সংগ্রহে আছে :
 1. Thomas Reid, *The Works of Thomas Reid* ; now fully collected with selections from his unpublished letters. Preface, notes and supplementary dissertations by Sir William Hamilton, 6th edition, Edinburgh, 1863. 2 vols.
 2. Dugald Stewart, *Dissertation*, William Hamilton, ed., Edinburgh, 1854.
 3. Dugald Stewart, *Elements of the Philosophy of the Human Mind*, William Hamilton, ed., Edinburgh, 1854, 3 vols.
 4. Dugald Stewart, *Lectures on Political Economy*, William Hamilton, ed., London, 1855, 2 vols.
 5. Dugald Stewart, *Philosophical Essays*, William Hamilton, ed., Edinburgh, 1855.
 6. Dugald Stewart, *The Philosophy of the Active and Moral Powers of Man*, William Hamilton, ed., Edinburgh, 1855, 2 vols.
 7. Dugald Stewart, *Outlines of Moral Philosophy*, London, 1870.
 8. Dugald Stewart, *Translations of the Passages in Foreign Languages Contained in the Collected Works*, Edinburgh, 1860. Supplementary Volume of Collected Works.
৪১. Elliot Walter Madge, Henry Derozio, Subir Ray Choudhuri, ed., Calcutta, 1982, p. 44.
৪২. পদুমকেশ দে সরকার, 'পাঠক বিদ্যাসাগর', কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৪-৮।
৪৩. Thomas Reid, *The Works of Thomas Reid*, William Hamilton, ed., vol. I, Edinburgh, 1863, p. 12.
৪৪. 'রত্নপরীক্ষা', উপসংহার, 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ৬৬২-৬৬৪।

৪৫. Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, ed. and tr. by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, New York, 1973, pp. 321—334.

৪৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিবিধ প্রবন্ধ', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস - সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৬, পৃ. ২৮১-২৮৯।

৪৭. 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' [প্রথম পদ্যুত্তর], 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ২৪।

৪৮. 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' [প্রথম পদ্যুত্তর], 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ১৯৬।

৪৯. 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', [প্রথম পদ্যুত্তর], 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ২৫০।

৫০. 'যেরূপ শূন্যতে পাই, তাঁহারা [ইংরেজ জাতি] রাজ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া, এ দেশে অধিকার বিস্তার করেন নাই; সর্ব্বাংশে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনই তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের একমাত্র উদ্দেশ্য।' 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', [প্রথম পদ্যুত্তর], 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সমাজ', পৃ. ২৫৩।

৫১. বিপিনবিহারী গদ্যুত্তর, 'পদ্যুত্তর প্রসঙ্গ', কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১১৪।

৫২. ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ', 'নবোদয়', প্রথম বর্ষ, ১৩৬২, পৃ. ৭৭। ইন্দ্রমিত্র, 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২০-তে উদ্ধৃত।

৫৩. আমি, ইচ্ছে করেই, টমাস জেমস-এর পাঠ (১৮৪৮) ব্যবহার না করে ইসপের এই আরও সাম্প্রতিক অনুবাদটি ব্যবহার করলাম :

Lloyd W. Daly, *Aesop without Morals*, New York, 1961, pp. 111-112.